# ॥ ফিলাডেলফিয়া রহস্য ॥

পরিতোষ মজুমদার

॥ কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৭০

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১ নিতাই বাবু লেন, কলকাতা-৭০০০১২
মুদ্রক : স্রোতা ঘোষ, এস. জি. প্রিণ্টার্স, ১৪৪/১, রাজা
রামমোহন সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯

স্টুটগার্ট ঃ পশ্চিম জার্মানীর
বন্ধুবর পিটার ব্রাউনকে
প্রবাসের দিনগুলোয় যাদের আতিথ্যে
ঘরের কোণের স্পর্শ পাই।

পরিতোষ মজুমদার

বিজ্ঞান আমাদের বহু কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। কিন্তু কল্পনার কি শেষ আছে? আমাদের মধ্যে জীবনে অন্তত একবার কে না চায় অদৃশ্য হতে? আজকে বৈজ্ঞানিকদের কাছে মানুষের এই অতি প্রাচীন ইচ্ছেটাই কিন্তু বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে এই অদৃশ্যতা যদি যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা যায়, তবে শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেদের বা নিজেদের যুদ্ধ-বিমান বা যুদ্ধ-জাহাজ যেমন নিরাপদে রাখা যায়, তেমনি অদৃশ্য হয়ে শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণও করা যায়।

আমেরিকা কি এ ধরনের এক মারাত্মক এক্সপেরিমেন্ট করেছিল? আস্ত একটি জাহাজকে অদৃশ্য করতে সে কি সফল হয়েছে? তার ফলাফল কি? আইনস্টাইন কতটা জড়িয়ে আছেন এই ঘটনার সঙ্গে? সব তথ্য পাওয়া যাবে এই বইয়ে। এ এক মারাত্মক ভয়াবহ কাহিনী।

## ॥ প্রসঙ্গত ॥

ফিলাডেলফিয়া নেভেল ইযার্ড যে জাহাজের ওপরে একস্‌পেরিমেণ্ট চালায়, সেই জাহাজের একজন নাবিক ভিক্‌টর সিলভারম্যান বর্তমানে পেনসিলভেনিয়ার বাসিন্দা। অল্প বয়েসেই পর পর তিনবার হার্ট অ্যাটাক হয়। হয়তো বা এই একস্‌পেরিমেণ্টের দৌলতেই। এখনো যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। তবু যতোটুকু তার কাছ থেকে জানা গেছে, তা'তে একস্‌পেরিমেণ্টের সময়ে সিলভারম্যান যে এলরিজ্‌ ডি ই ১৭৩ ড্রেসট্রয়ারেই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতেই সিলভারম্যান নেভীতে নাম লেখায়। সিলভারম্যান ছাড়া আরো চল্লিশজন নাবিকের ওপর দায়িত্ব বর্তায় গোপনীয় এক নেভেল প্রজেক্টের একস্‌পেরিমেণ্টের জন্য ঠিক করা জাহাজ ডি ই এলরিজে।

সিলভারম্যানের খেয়াল আছে, জাহাজের ওপরে এতো বেশী রাডার ছিল যে জাহাজটাকে এক নজরে যুদ্ধ জাহাজ বলেই মনে হচ্ছিলো। ক্রিষ্টমাস ট্রি'র মতো একটা বিশেষ ধরনের মাস্তুলও ছিল ডেকের ওপরে। অনেকটা এন্‌টেনার মতোই গড়ন মাস্তুলটার।

একস্‌পেরিমেণ্টটার প্রস্তুতির সময়ে জাহাজের ওপরে একজন সিভিলিয়ানকেও দেখেছিল সিলভারম্যান। লোকটাকে দেখে সিলভার-ম্যান ঠাট্টা করেই আর এক সঙ্গী নাবিককে বলেছিল,—লোকটার চুল ছাটার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে হে। পরে অবাক হয়, যখন জানতে পারে লোকটা আর কেউ নয়, স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন।

সিলভারম্যানের ধারণায় অন্তত তিনজন নাবিক জানতো কোথায় সুইচ্‌গুলো, যেগুলো দ্বারা অপারেশন সুরু করা হবে। সিলভার-ম্যানের আরো মনে আছে তীরের একটা পাওয়ার হাউস থেকে

জাহাজের ওপরে অনেকগুলো ইলেকট্রিকের তার টানা হয়েছিল। আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ্ গুলোকে অন করে দিলে এমন একটা বিকট শব্দ হয় যে সেই শব্দের আওয়াজ সহ্যের বাইরে চলে যায়। আরেকবার নিজের চারদিকে এমন ঘন কুয়াশা দেখতে পায়, যে ভাবে জাহাজ থেকে ও হয়তো বা ছিটকে পড়ে গেছে। যখন সত্যি ওর ভাগ্যে কি ঘটেছে দেখতে জাহাজের চারদিকে তাকায়, দেখে আবছা কতগুলো অবয়ব চলাফেরা করছে। নাবিক বলে চেনা যায় না। ওদের মতো অবয়বও তাদের নয়। ওরা কেউ-ই তখন ডকের ওপরে নেই। কোথায় যে ঠিক তা' সিলভারম্যান স্মরণে আনতে পারে না।

হঠাৎ ঘন কুয়াশা সরে যায়, সিলভারম্যান দেখে ওরা নরফোল্ক বন্দরে দাঁড়িয়ে। বন্দরটাকে চিনতে অসুবিধা হয় না ওর; কারণ অন্য জাহাজে বেশ কয়েকবার নরফোল্ক বন্দরে এর আগে সিলভার-ম্যান এসেছে। অকস্মাৎ আবার সবুজ রঙের ঘন কুয়াশা চারদিক ঘিরে ধরে। সিলভারম্যান দেখে ওদের জাহাজটা ফিলাডেলফিয়া নেভেল ইয়ার্ডের একটা ডকে দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে সিলভারম্যান। সেই স্বপ্ন মুহূর্ত ক'টায় মন নামক বস্তুটা হারিয়ে যায় নি তো? এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সিলভার ম্যান সেই মুহূর্তক'টায় ওর আর ওর সঙ্গী নাবিকদের ঠিক কি ঘটে ছিল। এই ঘটনার পরেই জাহাজটাকে ক্যাপ্টেন নদীর মুখে সরিয়ে নিয়ে যায়। সারারাত জাহাজ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

সংবাদপত্রে খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে দু'জন নাবিকের তিনশো ডলার করে জরিমানা করা হয়। একজনের নাম উইলকেন, আরেকজন পোলিশ বা উক্রেনিয়াম হবে। পুরো নাম সিলভারম্যানের মনে নেই। তবে এটুকু স্মরণ করতে পারে যে 'ডি' দিয়ে নামটা শুরু হয়েছিল।

সিলভারম্যানের এও মনে আছে, তিনজন সিভিলিয়ান জাহাজ থেকে নামলে কয়েকজন দৌড়ে ওদের কাছে আসে। পরস্পর বলাবলি করতে থাকে যে এক্সপেরিমেণ্টটা প্রচণ্ড রকমের সফল

হয়েছে। সেই তিনজন লোক যখন জাহাজ থেকে নামে, তখন তাদের হাতে কালো রঙের ছোট চামড়ার একটা বাক্‌সো ছিল।

হয়তো বা সমুদ্রের ওপরের আরেকটা জাহাজ থেকে এই এক্স্‌-পেরিমেন্টটাকেই এলেণ্ডে দেখেছিল। এরপর সিলভারম্যানকে ছ' মাস বেথেস্‌দা নেভেল হাসপাতালে কাটাতে হয়। আরো তিনজন নাবিক ছিল ওর সঙ্গে সেই হাসপাতালে। হাসাপাতালটার অবস্থান ছিল গোপন একটা অঞ্চলে। একজন এডমিরাল, সিলভারম্যানের যতোদুর মনে আছে এডমিরাল বোভেনই হবে, ওদের হাসপাতালে দেখতে এসেছিল।

এলরিজ্‌ ডি ই ১৭৩ যে এই হঠাৎ টাইম এবং স্পেসের মধ্যে চলে গিয়েছিল, নরফোল্ক বন্দরে দাঁড়ানো টলি ওয়েলস্‌ তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

বর্তমানে টলি থাকে সাউথহামটন, ইংল্যাণ্ডে। ও আরো পাঁচজন ব্রিটিশ মার্চেন্ট শিপের নাবিক লিবার্টি শিপের বার্থের জন্য দাঁড়িয়ে-ছিল নরফোল্ক বন্দরে। ইংল্যাণ্ডে ফেরার জন্য। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। হঠাৎ দেখে বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্রে প্রায় আকাশ ঢাকা এক মেঘের রাশি। তার মধ্যে একটা ডেসট্রয়ার। চোখের পলকের জন্য দেখা দিয়েই ডেসট্রয়ারটা মিলিয়ে যায়। নাবিকেরা যখন ব্যাপারটায় হতচকিত, নেভেল নিরাপত্তা বাহিনী আর তীরের পাহারাদারেরা ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কি দরকার মিছিমিছি ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর! যদি আলোচনা-টালোচনা করলে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা আসে। সেটাই হয়তো বা এলরিজ্‌ ডি ই ১৭৩ ডেস্‌-ট্রয়ার। যার ওপরে ইলেকট্রিক কামাফ্লেজ এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় তিনটে জাহাজে অফিসার হিসেবে কাজ করেছে ফ্রেডরিখ্‌ ট্রেসি। তার মধ্যে একটা জাহাজের নাম ছিল ইউ এস এস এনটিটেম সি ভি—৩৬।

ট্রেসির এক সহকর্মী ভি জে মায়ার্স ১৯৪৪ সালে ওদের জাহাজ

যখন ফিলাডেলফিয়া ড্রাইভে, তখন ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট সম্পর্কে বলেছিল। মায়ার্স এমন কি পরের ডকটা দেখিয়ে বলে যে সেই ডক থেকেই নাকি জাহাজটাকে অদৃশ্যও করা হয়েছিল।

সব কথা শোনার পর ট্রেসি বলেছিল,—দেখ মায়ার্স, আমি তোমার কথার একটা অক্ষরও বিশ্বাস করি না।

উত্তরে মায়ার্স বলেছিল,—জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না।

পরের বছর এনটিটেম আবার ফিলাডেলফিয়া নেভেল ইয়ার্ডে এলে পরে, ওটার ওপরে আর একটা একস্‌পেরিমেন্ট চালানোর কথাবার্তা ওঠে। নাবিকেরা ভয় পেয়ে যায় ব্যাপারটাতে। তখন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন টেগু একটা গোপনীয় মেমো নাবিকদের সামনে পড়ে; যাতে বলা হয়েছে ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে এই ধরণের একস্‌পেরিমেন্ট একটা পেট্রোল ক্র্যাফ্‌টের ওপর করা হয়েছিল। পেট্রোল ক্র্যাফট্‌টা ফিলাডেলফিয়া নেভী ইয়ার্ড থেকে অদৃশ্য অবস্থায় যায় নরফোল্ক বন্দরে। আবার ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়ায়। জাহাজের কয়েকজন নাবিক হারিয়ে যায়। বাকীরা শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ক্যাপ্টেন অবশ্য বারবার বলে যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যাপার। সুতরাং কোন রকমেই বাইরে যেন প্রকাশ করা না হয়। তা'হলে যুদ্ধের আইন অনুযায়ী বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়া হবে।

ট্রেসির ধারণায় নেভী শিপ ইয়ারমাওয়াকেই কোষ্ট গার্ড এলরিজ্‌ নামকরণ করা হয়েছিল। স্রেফ এই একস্‌পেরিমেন্টটা চালানোর জন্য। আর ট্রেসি নাকি এও শুনেছিল যে এলরিজের নাবিকদের বেথেস্‌দা নেভেল হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। হাসপাতালটা এমন অঞ্চলে ছিল, যাতে কেউ সেই নাবিক-দের সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারে।

## ॥ এক ॥

কলরাডো স্প্রিংয়ের চারপাশের আবহাওয়া সারা বছরই সুন্দর থাকে। তবে বিশেষ করে গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার মুখে। যখন সারা-দিনের উত্তাপের শেষে রাত তার ঠাণ্ডা হাতের পরশ বুলিয়ে দেয়; আকাশটা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ঝকঝক করে, তখন অঞ্চলটার সত্যি তুলনা হয় না।

১৯০০ সালের এমনি এক সন্ধ্যায় আমেরিকান এয়ার ফোর্সের দু'জন অফিসার মেরীল্যাণ্ডের জেমস্ ডেভিস আর টেকসাসের অ্যালেন হিউজ্ হাতে কোন কাজ না থাকায় কাছের ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে কিছু ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাটায় ফিল্ম ভর্তি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আবহাওয়াটা অপেক্ষাকৃত গরম হওয়া সত্ত্বেও মনোরম। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যার ধূসরতা নেমে আসার ভয়ে হিউজ্ চাঁদের ছবি তোলার তোড়জোড় সুরু করে দেয়; ডেভিস আর কি করবে? গত কয়েক মাস ধরে কলরাডো স্প্রিংয়ের এয়ার বেসে খাটুনী তো কম যায় নি। তাই অলস পায়ে পার্কের এধার ওধার ঘুরতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা লোক ডেভিসের দিকে এগিয়ে আসে। লোকটাকে অবশ্য পার্কে ঢোকার পর ডেভিস পার্কের মধ্যের শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে। তবে নজরে আসে নি। বেটেখাটো টাক মাথা লোকটাকে দেখতে রুক্ষ প্রকৃতির বলে মনে হয়। অবশ্য চাউনিতে একটা স্বপ্নালু ভাবভঙ্গি ছড়ানো।

ডেভিস ভাবে লোকটা বোধহয় ওর কাছে হাত পেতে কোন সাহায্য চাইতেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য লাগে যখন লোকটা এগিয়ে এসে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে— মনে হচ্ছে আপনি এয়ার ফোর্সে চাকরী করেন? তা' কেমন লাগছে এয়ার ফোর্সের চাকরি?

ডেভিস নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দেয়,—চাকরীটা তো ভালোই লাগছে। তবে খাটা খাটুনী অত্যন্ত বেশী। তাই বিশ্রামের বড় অভাব এই চাকরীতে। অসুবিধে বলতে একটাই। লোকটাও তা' স্বীকার করে নেয়।

কথায় কথায় কথা বাড়ে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় উভয়ে গল্পে মত্ত।

বেঁটে খাটো লোকটা বলে,—জানেন, এক দিন আমিও অফিসার ছিলাম। হ্যাঁ, ইউ এস এ'র নেভীতে। যুদ্ধের সময়। তবে আমার প্রতি ব্যবহারটা ভালো করা হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত আমাকে পুরো ঘটনার বাইরে রাখা হয়। পাগলের দল যতোসব!

আঙ্গুল দিয়ে মাথার একটা দিক আলতো করে টিপে বলে,--কিন্তু তাই বলে আমি তো আর পাগল হয়ে যাই নি। সেই একস্‌পেরিমেণ্টটার জন্যই আজ আমার এই হাল হয়েছে। এতো চাপ সহ্য করতে না পেরে আমি-ই ছিটকে বেরিয়ে গেছি। কথাটা শেষ করে লোকটা পকেট থেকে একটা আইডেনটিটি কার্ড ডেভিসের চোখের সামনে ধরে বলে,—দেখছেন, আমি এতোক্ষণ যা বলছিলাম। ব্যাপারটা ডেভিসকে কৌতূহলী করে তোলে। বলে,—একস্‌পেরিমেণ্ট? কি ব্যাপার খুলে বলুন তো? কী ধরনের একস্‌পেরিমেণ্ট সেটা?

লোকটা ডেভিসের জিজ্ঞাসায় যে উত্তর দেয়, শুনে তো ওর কথা বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

—অদৃশ্য করে দেওয়ার একস্‌পেরিমেণ্ট। হ্যাঁ, এরা তখন চেষ্টা করছিল পুরোপুরি একটা জাহাজকে অদৃশ্য করে দিতে। একস্‌পেরিমেণ্ট যদি সফল হতো, তবে এর মতো কামাফ্লেজ আর হওয়া সম্ভব ছিল না। জাহাজ নিয়েও ব্যাপারটায় আংশিক সফল হয়েছিল। তবে আমরা, যারা জাহাজের ভেতরে ছিলাম, তাদের কাছে জিনিষটা সুখপ্রদ হয় নি। সেই প্রচণ্ড শক্তির বিকীরণ আমাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের এই অবস্থা। অবশ্য ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত জাহাজে করে যাওয়ার কাজটা নেওয়াই আমার ঠিক

হয় নি। অত্যন্ত গোপনীয় ছিল একস্‌পেরিমেন্টটা। ইচ্ছে করলেই আমি অস্বীকার করতে পারতাম। তবে কার নি। কিন্তু একস পেরি-মেন্টটার পরিণতি যদি আমার জানা থাকতো, যে করেই হোক নিজেকে কিছুতেই আমি গিনিপিগ হ'তে দিতাম না।

ডেভিসের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটে নি। বরং পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে ওকে আরো বেশী কৌতুহলী করে তোলে।

—ব্যাপারটার মাথা মুণ্ডু তো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কি বলতে চাইছেন ? মানে আমেরিকান নেভী এমন একটা একস পেরিমেন্ট করতে চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে অদৃশ্য করে দিতে পারে ?

লোকটা এবার ধীর গলায় উত্তর দেয়, —হ্যাঁ। ইলেকট্রনিক কামাফ্লেজ। এটা এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কামাফ্লেজ। শক্তি বিকীরণের ক্ষেত্রটাকে নাড়িয়ে দিয়ে যা তৈরী করার চেষ্টা হয়েছিল। তবে ঠিক কি ধরনের শক্তি এইক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা আমার জানা নেই। অনেকখানি শক্তিকে যে এই কারণে বিকীরণ করা হয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। আর সেই বিকীরণ সহ্য করে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কারোর ছিল না। এবং সেই বিকীরণ এক এক জনের ওপর এক এক রকমের প্রতিক্রিয়া কারে। কেউ একটা জিনিষকে দুটো করে দেখতে শুরু করে ; কেউ বা হাসতে আরম্ভ করে তা' আর থামাতে পারে না কয়েকজন তো সর্বক্ষণ পাড় মাতালের মতো টলে টলে পড়ে। আর বাদ-বাকীরা মারা যায়। এদের মধ্যে কয়েক জন আবার এমন একটা পৃথিবীতে গিয়ে হাজির হয়, যারা জাগতিক ভাষায় কথা বলে না। বেশ কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ একস্-পেরিমেন্টের ফলাফল স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে অবশ্য সেই দলের বেশীর ভাগই মারা গেছে। যাই হোক, তাদের সঙ্গে আর আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। অবশ্য যারা প্রাণে বেঁচে গেছে, একস্‌পেরিমেন্টের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা নাকি পঙ্গু। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে। চাকরী করা আর নাকি

তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের অবসর ভাতা দিয়ে তাড়ানো হয়েছে। কিছুটা বিকৃত গলাতে লোকটা কথাগুলো বলে।

—কিন্তু কেন? ডেভিস জিজ্ঞাসা করে।

ইতিমধ্যে কয়েকগজ দূর থেকে হিউজে্র কানে ওদের আলোচনার টুকরো গেছে, এগিয়ে এলে ডেভিস লোকটার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়।

হিউজের পরিচয়ের পর লোকটা বলে,—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশী হলাম।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে পরে ডেভিস আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, একস্‌পেরিমেন্ট সফল না হওয়ায় এই লোকগুলোকে মানসিক ভারসাম্য হারানোর দোহাই দিয়ে ছাঁটাই করে দিয়েছে।

—ঠিক তাই। রহস্যময় লোকটা রহস্যের হাসি হাসে। এই ব্যাপারটাই ঘটেছে। অবশ্য পেনসন দেওয়ার আগে আমাদের কয়েক মাস এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

—বিশ্রামের জন্য? ডেভিস জিজ্ঞাসা করে।

—না তা' নয়। ব্যাপারটা যাতে আমরা ভুলে যাই। শেষমেষ আমাদের দিয়ে গুপ্ত শপথও করিয়ে নিয়েছে। যদিও ওরাও জানতো এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেবে। তা, আপনাদের খবর কি? আপনারা তো এয়ার ফোর্সে আছেন। আমার কথাগুলো কি বিশ্বাস হয়?

ডেভিস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে,—জানিনা। তবে ব্যাপারটা যে অদ্ভুত ধরনের তাতে সন্দেহ নেই। বড় বেশী অবিশ্বাস্য।

—হতে পারে অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন যা বলেছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্য। অবশ্য কেউ যাতে বিশ্বাস না করে তার জন্যই যে আমাদের পাগল বলে নেভীর চাকরী থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। যদি ইউ এস এ নেভীকে এ বিষয়ে কোন দিন কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তবে সোজা বলে দেবে এগুলো একদল

পাগলের প্রলাপ। পাগল বলে গলায় ঝোলানো সার্টিফিকেট দেখে কে আর আমাদের কথা বিশ্বাস করতে যাচ্ছে? বা সেই কথার গুরুত্ব দিচ্ছে? যাই হোক গল্পটা বললাম, এখন বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদের ওপর।

ডেভিস আর হিউজ পরস্পরের দিকে তাকায়। হিউজের চোখের তারায় লেগে থাকা বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তবে নাড়া খাওয়া বিশ্বাস নিয়ে ঠিক কি বলবে ভাবতে ভাবতেই দেখে লোকটা অন্য আরেকটা অজাগতিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সূর্যের স্থান পরিবর্তন, আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি নিয়ে লোকটা তখন ব্যস্ত।

ঘণ্টাখানেক পরে লোকটাকে পার্কে রেখেই ওরা দু'জনে এয়ার বেসে ফিরে আসে। ততোক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। কলরাডোর বাতাসে পড়েছে হিমের ঝড়। জামাকাপড়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া সেই হিমেল বাতাস ওদের শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

এই ঘটনার পরের কয়েকটা মাস ব্যাপারটা ওদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। মাঝে মাঝেই দু' জনের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনাও চলে ব্যাপারটাকে নিয়ে। হিউজ কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক বিশ্বাস করে নি। অবশ্য ঘটনার কয়েকটা টুক্‌রোই ও শুনেছে। তবে উভয়েই সেই সন্ধ্যায় পার্কে হঠাৎ দেখা পাগল লোকটার কথায় কতোটুকু সত্য আছে, আদৌ সত্যের ছিঁটে ফোঁটা আছে কিনা তা' নিয়ে রীতিমতো ভাবতে সুরু করে। লোকটা কি সত্যি পাগল? নাকি অন্য কিছু?

শেষ পর্যন্ত ডেভিসকে এয়ার পোর্টের চাকরী থেকে ছাঁটাই করা হয়। আর হিউজ বদলী হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলে দু'জনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

বেশ কয়েকবছর পরে, ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাস নাগাদ ব্যাপারটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আসলে ডেভিস ব্যাপার-টাকে ভুলতে পারে নি। অজানা ছোটখাটো লোকটা, তার বলা একস্‌পেরিমেন্ট কিছুই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি ডেভিস।

কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে ব্যাপারটা সে বলে। সাংবাদিকরা হিউজের কথা জিজ্ঞাসা করলে ডেভিস জানায় এয়ারপোর্টের চাকরী যাওয়ার পর ওর সঙ্গে হিউজের আর দেখা হয় নি। সুতরাং ও জ নে না বর্তমানে হিউজ কোথায় আছে।

সপ্তাহ খানেক ধরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাংবাদিকরা হিউজকে খুঁজে বার করে। জিজ্ঞাসা করলে হিউজ উত্তর দেয়,—ডেভিস আর আমি পার্কে বেড়াতে গেলে আমাদের সংগে অদ্ভুত একটা লোকের দেখা হয়। তারপরেও আমরা পার্কে এক সংগে বেড়াতে গেছি। কিন্তু লোকটাকে আর দেখি নি। বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বিষয়টাকে ঘিরে আমাদের মধ্যে কম আলোচনা হয় নি। তবে বেশ কয়েক বছর পেরিয়ে যাওয়ায় আমার ঠিক মনে নেই লোকটা কি বলেছিল। অবশ্য ব্যাপারটা যে রহস্যজনক তা'তে সন্দেহ নেই।

হয়তো বা ফিলাডেলফিয়া নেভীর কোন প্রজেক্টের এক্স্‌-পেরিমেন্ট নিয়ে,—সাংবাদিকরা হিউজকে খেই ধরিয়ে দেয়।

একটুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে হিউজ উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কয়েকটা রহস্যময় ঘটনার কথা বলেছিল। সেগুলো বিস্তারিত অবশ্য আমার মনে নেই। কিন্তু কথাবার্তা সবই ছিল বিস্ময়কর এক এক্স্‌-পেরিমেন্টকে ঘিরে। তবে সত্যি বলতে কি, আমি কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি।

চেষ্টা করে দেখুন না। বিস্তারিত মনে করতে পারেন কিনা? সাংবাদিকরা অনুরোধ করে।

—সম্ভব নয়। হয়তো বা ডেভিস পারলেও পারতে পারে। কারণ আলোচনাটা ওর সঙ্গেই হয়েছিল। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম।

-আপনার সঙ্গে ডেভিসের পরে এই বিষয় নিয়ে কোন কথাবার্তা হয়েছে!

হিউজ উত্তর দেয়,—না। ১৯৭৩ সালের জুন মাসে আমি এয়ারফোর্স ছেড়েছি। আর ডেভিস কলরাডো স্প্রিং ছেড়েছে ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে।

—লোকটা পার্কে ঢুকে হঠাৎ আপনাদের ছ'জনকেই বা ঘটনাটা বলতে গেল কেন? বলতে পারেন এর কারণটা কী হ'তে পারে।

—কারণটা অবশ্য আমারও জানা নেই। তবে মনে হয় আমাদের এয়ারফোর্সের পোষাক পরা দেখেই হয়তো বা বেছে নিয়েছিল; মনের ভেতরের চাপা বোঝাটা যাতে নামিয়ে হাল্‌কা হ'তে পারে। আমরা অবশ্য এয়ারফোর্সে চাকরীর সময়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি। কয়েকজন বন্ধুকেও সেই সময় বলেছিলাম। তবে সবাই ব্যাপারটাকে গাঁজাখুরি বলেই ধরে নিয়েছিল।

—আপনার কি কোন ধারণা আছে লোকটা কোথা থেকে এসেছিল। বা কোনখানে থাকতো?

—না। তবে লোকটা ওপরের দিকে দেখিয়েছিল। তারপরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কলরাডো শহরের আশেপাশে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই লোকটাকে চিনতে পারতাম। তবে আর কখনো দেখি নি। এই ঘটনার পরেও আমরা বেশ কয়েকবার পার্কে গেছি।

—লোকটা কি ওকে চাকরী থেকে ছাটাই করা সম্পর্কে বা আহত হওয়ার ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছিল?

—যতোদূর মনে পড়ে, চাকরী থেকে ছাঁটাইয়ের একটা কারণ লোকটা আমাদের কাছে বলেছিল। কারণটা আমার মনে নেই। কী একটা একস্‌পেরিমেন্টের ব্যাপারে। সেটা আমি স্পষ্ট মনে করতে পারছি না।

হিউজের কথাবার্তায় রহস্যময় ব্যাপারটার ওপরে আরো এক পোঁচ রহস্য জড়ায়। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরেই ঘটনাটা নিয়ে হৈ চৈ কম হয় নি। হয়তো বা ওর শেষও হবে না। ইনভিসিবিলিটি প্রজেক্ট। এরপরে আর মানুষকে অদৃশ্য করার চেষ্টার কথা শোনা যায় নি। অনেকেই ব্যাপারটাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কারোর আবার ধারণা মহাজাগতিক বা ফোর্থ ডাইমেন-সান থেকে লোকটা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাটায় কতোটুকু সত্যতা আছে তা খুঁজে বার করা আরো মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য গত বছর কুড়ি ধরেই শোনা যাচ্ছিলো যে ইউ এস এ নেভী ফিলাডেলফিয়া নেভী ইয়ার্ডে অদ্ভুত ধরণের একটা প্রজেক্টের ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গবেষণা চালিয়েছিল। অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে। সেই একস্‌পেরিমেণ্টের দরুণ নেভী শক্তিশালী এক ইলেকট্রনিক শক্তির ক্ষেত্র তৈরী করতেও সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কিছু সময়ের জন্য পুরো ব্যাপারটাই ওদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। আর তার ফলেই জাহাজটা অদৃশ্য হয়। ফিলাডেলফিয়া থেকে নরফোল্ক এবং নরফোল্ক থেকে জাহাজটা অদৃশ্য অবস্থায় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়ায়।

অদৃশ্য? হ'তে পারে। উত্তরটা ইতিবাচক হওয়াই সম্ভব। খোঁজাখুঁজিতে এমন জিনিষ সব নিত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে যা বিস্ময়কর। সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এও তেমনি একটা ঘটনা।

## ॥ দুই ॥

একজন রহস্যময় বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যটা আরো ঘনীভূত হয়। বৈজ্ঞানিক হিসেবে লোকটা সম্ভবত আরো রহস্য-জনক। বৈজ্ঞানিক মরিস কেচাম জেস্‌পের আগের জীবন সম্পর্কে খুব বেশী একটা কিছু জানা যায়না। কয়েকটা প্রচলিত তথ্য ছাড়া। মানুষটার অনেক বিষয়েই অনুসন্ধিৎসা ছিল। একাধারে বৈজ্ঞানিক, এস্‌ট্রোনমার, এস্‌ট্রোফিজিসিষ্ট, ম্যাথমেটিসিয়ান, গবেষক, লেকচারার, এবং কয়েকখানি বইয়ের লেখক। বিশেষ করে নিজের কাজের ব্যাপারে মরিস কেচম শুধু যে প্রচার বিমুখ ছিল তাই নয়, বরং চেষ্টা করতো কোনরকম প্রচার যেন ওর সম্পর্কে না হয়। নামটাও পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে রেলের রাস্তা বানিয়ে, বিভিন্ন ব্যবসায়ে অর্থ লগ্নী করে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিল মরিসের এক কাকা। তা'ছাডা ফিল্মান-

থে্যাফিস্ট হিসেবেও সেকালে কিছুটা নাম ডাক ছিল ভদ্রলোকের। সেই কাকার নাম ছিল কেপে মরিস কে জেস্সুপ। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর বিন্দু রজভিলে, ইণ্ডিয়ানায় জেস্সুপ ১৯০০ সালের ২০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করে। ওর বয়েস যখন প্রায় সতেরো, দেশ তার কয়েক সপ্তাহ আগে মাত্র প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সেই বয়েসের অনেক কিশোরের মতো জেস্সুপও গিয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে ইউ এস এ আর্মির সার্জেণ্ট হয়। কিন্তু হাই স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে জেস্সুপ আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ফিরে আসে। ড্রেক ইউনির্ভাসিটি, ড্রেস মাইনস্, আইও এবং অ্যান আরবরের মিচিগান ইউনির্ভাসিটির এস্ট্রোনমি ও ম্যাথামেটিকসের ইনস্ট্রাক-টারের কাজ পায়।

১৯২০ সালের শেষাশেষি যখন জেস্সুপ মিচিগান ইউনিভার্সিটিতে ডক্টর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই মিচিগান ইউনিভার্সিটির অরেতুও ফ্রি ষ্টেটের ব্লয়েমফনটোনের লেমণ্ট-হুসি-অবজারভেটারীর তরফ থেকে একদল গবেষকের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকা ভ্রমণের সুযোগ আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাউদার্ন হাম্পসায়ারে তখন সবচেয়ে বড় রিফ্রডাকটারী টেলিস্কোপ ছিল। সেই টেলিস্কোপের সাহায্যে জেস্সুপ আকাশে বেশ কয়েকটা তারার উপস্থিতি আবিস্কার করে। যা নাকি পরে লণ্ডনের রয়াল এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাটির তালিকায় স্বীকৃতি পেয়েছে।

আমেরিকায় ফিরে এসে এই গবেষণালব্ধ ফল এস্ট্রোফিজিক্সের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগায় জেস্সুপ। এবং ১৯৩৩ সালে ওর এই বিষয়ের গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। তবে মনে হয় না যে এই বিষয়ে জেস্সুপ ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছিল। অবশ্য সবাই ওকে ডক্টর জেস্সুপ বলেই ডাকতো। সুতরাং আমরাও এখন থেকে ওকে ডক্টর জেস্সুপ বলেই অভিহিত করবো।

সেই বছর গুলোতে আমেরিকার চরম দুর্দিন চলেছে। অর্থ-নৈতিক হতাশা প্রায় গ্রাস করতে উদ্যত। এমন কি টাকার

অভাবে পেশায় নিযুক্ত লোকেদের মাইনে কড়ি দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই সময় ডক্টর জেস্লুপকে ইউ এস ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একদল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ব্রাজিলে পাঠানো হয়। এইসব বৈজ্ঞানিকদের ওপরে দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাজানের জলে কাঁচা রবারের অস্তিত্বের কারণ খুঁজে বার করার। একজন এস্ট্রোনমারের পক্ষে কাজটা বেখাপপা হলেও চাকরী তো বটে; উপরন্তু কাজটা নেহাং একঘেয়েও নয়।

ব্রাজিলের সেই গহন অরণ্য থেকে ফিরে এলে ওয়াশিংটনের কার্নেগী ইনষ্টিটিউটের পক্ষ থেকে আর্কলজিক্যাল একস্‌পিডিসানের জন্য ফটোগ্রাফার হিসেবে ডক্টর জেস্লুপকে পাঠানো হয় মধ্য আমেরিকায়। মায়ান ধ্বংসাবশেষের খোঁজে। মনে হয় ততোদিন ডক্টর জেস্লুপকে অরণ্য নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করে ফেলেছে।

মেক্সিকো থেকে ইন্‌কা এবং প্রাক্‌ ইনকা সভ্যতা আবিষ্কারের খোঁজে গিয়ে হাজির হয় পেরুতে। সেখানকার ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে শুনে ডক্টর জেস্লুপের অদ্ভুত এক ধারণা হয়। বিরাট বিরাট মূর্তিগুলো, তার নিখুঁত গড়ন ইত্যাদি দেখে ওর ধারণা হয় কিছুতেই এগুলো মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না। আর এই সব মূর্তিগুলোকে যথাস্থানে রাখার জন্য নিশ্চয়ই ইলমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী জানোযারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এরিখ ভন দানিকেনের মতোই ডক্টব জেস্লুপের ধারণা হয় এই সব সুবিশাল মূর্তিগুলো ইনকাদের তৈরী নয়; মহা প্লাবনের আগের আদিম মানুষের সৃষ্টি। আর মূর্তিগুলোকে জায়গায় বয়ে আনা হয়েছিল বিশেষ ধরনের এক মহাকাশযানের সাহায্যে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, ডক্টর জেস্লুপ এসব কথা বলেছিল দানিকেন বলার বহু আগে। 'তখন অবশ্য কেউ ওর এই কথাগুলোর কোনরকম গুরুত্ব দেয়নি। বিশেষ করে একজন বৈজ্ঞানিকের মুখে তো এই ধরনের কথা একেবারেই বেমানান। তিন দশক পরে এটাই হলো আজকের জনপ্রিয় 'প্রাচীন মহাকাশ যাত্রী' তত্ত্ব।

বিজ্ঞানের গোঁড়ামিকে দূরে সরিয়ে রেখে, বৈজ্ঞানিক হিসেবে নিজের খ্যাতি এবং ভবিষ্যৎ বলতে গেলে একরকম অনিশ্চয়তার গর্ভে বাঁধা রেখে ডক্টর জেসুপ মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ গুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। ১৯৫০ সালের প্রথমদিকে নিজের খরচেই এইসব ধ্বংসাবশেষের পেছনের ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে। মেক্সিকোর সুউচ্চ মালভূমির মধ্যের সেই ধ্বংসাবশেষগুলো খুঁজতে খুঁজতে ডক্টর জেসুপ হঠাৎ এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করে বসে। তা'হলো ভৌগলিক পরিবর্তনের সময় সেখানে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির খাদ-মুখ মতো তৈরী হয়েছিল। প্রায় গোটা দশেক। আর এই খাদগুলোর মাপ গভীরতা ইত্যাদি চাঁদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া আগ্নেয়গিরির খাদ-মুখ লিনে এবং হিগিনিউম্ এন'র মতো।

আবার যে পথ ধরে ডক্টর জেসুপ এগিয়ে চলে তা কোন বৈজ্ঞানিকের পথ নয়। এই আগ্নেয়গিরির খাদ-মুখগুলোকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডক্টর জেসুপ রায় দেয় যে এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ থেকে কোন বস্তু নিক্ষেপের ফলে। ডক্টর জেসুপ এও ফাঁস করে দেয় যে ইউ এস এয়ারফোর্সের কাছে এই আগ্নেয়গিরির খাদ মুখগুলোর অনেক ছবি রয়েছে। মেক্সিকো গভর্ণমেন্টের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্ত করে আকাশ থেকে তোলা হয়েছে ছবিগুলো। তবে ছবি-গুলো এবং ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনে রাখা হয়েছে। আগ্নেয়গিরির খাদ-মুখগুলোর সৃষ্টির পেছনের কারণটা নিজের খরচেই খুঁজে বার করতে লেগে পড়ে ডক্টর জেসুপ। কিন্তু টাকায় ঘাটতি পড়ায় ১৯৫৪ সালে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় আমেরিকাতে ফিরে আসে।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ফ্লাইং সসার নিয়ে আলাপ আলোচনা কম হয় নি ; ডক্টর জেসুপ মনে করে অতীতে এই ধরনের কোন মহাকাশ যানের ব্যবহার ছিল, তারই পরিণতি রহস্যময় আগ্নেয়গিরির খাদ-মুখ বিশিষ্ট ধ্বংসাবশেষগুলো। ব্যাপারটা শুধু কৌতুহলই জাগায় না, বৈজ্ঞানিক হিসেবেও ওর মনের ভেতরের অনুসন্ধিৎসার আগুনে ইন্ধন জ্বালায়। ডক্টর জেসুপ ততোদিনে

দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে এগুলোর পেছনে রয়েছে সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। নিছক কল্পনা বিলাসীর সৃষ্টি নয়। এই সম্ভবত প্রথম যখন আন আইডেনটিভাইড ফ্লাইং অবজেক্টস অর্থাৎ উফোর ব্যাপারটাকে পাওয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলোর সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। ডক্টর জেসুপের মতে উফো বা ফ্লাইং সসারের রহস্য উদ্ধার করতে পারলে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বুদ্ধিতে যার এতোদিন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় নি সেইসব ঘটনা ঘটার কারণগুলোর হদিশ মিলবে। যেমন রহস্যজনকভাবে বরফ পড়া, বিরাট বিরাট পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়ানো বা সময় সময় আকাশ থেকে জন্তু জানোয়ার পড়া, ইত্যাদি। ডক্টর জেসুপের ধারণায় এইগুলোর পেছনে কাজ করছে এক অ্যান্টি গ্রাভিটি বা বিরুদ্ধ মাধ্যাকর্ষণ। শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন মহাজাগতিক বাসিন্দারা, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কখনোই হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

এতোদিন ধরে যেসব তত্ত্বগুলোকে মনের পাথরে থরে থরে সাজিয়ে এসেছে, ওযাশিংটন ডিসিতে ফিরে এইবার ডক্টর জেসুপ সেগুলোকে রূপ দেওয়ার জন্য একটা বই লিখতে বসে। কেননা ওর ধারণায় প্রতিটি ব্যাপারের পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপাত যার ওপরে হওয়া আবশ্যক। ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকাল ধরে এক নাগাড়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ব্যাপারটার ওপরে ১৩ই জুন, ১৯৫৫ সালে ওর বই 'দ্য কেস্ ফর দ্য উফো' প্রকাশিত হতেই চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। এমনভাবে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এর আগে আর কেউ দেয় নি। সবচেয়ে বড় কথা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর তার চুলচেরা বিচার করা হয়েছে বিজ্ঞানের আলোয়। বইটা প্রকাশের সময় জেসুপ ভাবতেও পারেনি কতো অসংখ্য রহস্যের সৃষ্টি করবে ওর এই আবিস্কার।

ডক্টর জেসুপের অবশ্য সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ছিল যে মোটিভ

পাওয়ারের সাহায্যে এই উফো চলাচল করে, তার উৎস সন্ধান। কারণ ওর ধারণায় এই মোটিভ-পাওয়ারের পেছনে যে যুক্তি কাজ করছে, সুপ্রাচীন এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগেও আজকের মতোই তা সক্রিয় ছিল। তার অস্তিত্ব ছিল ও এই পৃথিবীতেই। এদের ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে সেই যুগের লোকেরা ওদের ঈশ্বর আখ্যা দিয়েছিল। যা আজ লক্ষ লক্ষ বছর হলো আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

ডক্টর জেসুপের মতে, এই মোটিভ-পাওয়ারই মানুষের সব উন্নতির মূলে কাজ করছে। যা নাকি রকেট ফোর্সের থেকে অনেক বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেন্দ্র ছিল এই শক্তির উৎস। ১৯৫৫ সালে এই বইয়ের ব্যাপারে ডক্টর জেসুপ অদ্ভুত ধরনের একটা চিঠি পায়। চিঠিটা ওর নিয়মিত চিঠিগুলোর সঙ্গে এসেছিল পেনসিলভেনিয়া ডাক ঘরের ছাপমারা, বিভিন্ন রঙের পেন এবং পেনসিলে হিজিবিজি ধরনের হাতের লেখা। বেখাপ্পা অক্ষরগুলো। চিঠিতে লেখা বাক্যগুলোর মাঝে মাঝে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। পানচুয়েসান, অক্ষর বা শব্দের ব্যবহার—সবই অদ্ভুত রকমের। প্রতিটি লাইনের নীচে আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙে দাগ টানা।

তবে আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—চিঠি লেখার ভঙ্গী বা অক্ষরগুলো নয়, বরং তার বিষয়বস্তু। চিঠিটাতে জেসুপের বইয়ের বিশেষ যে জায়গাগুলোয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অগ্রাহ্য করে ভারী কোন বস্তু উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে, সেইগুলোর কথাই এমনভাবে লেখা, যেন লেখকের প্রাচীনযুগের সেই উত্তোলন পদ্ধতি সম্যকরূপে জানা এবং ডক্টর জেসুপের লেখার এই দিকটাতেই পত্রলেখক ওঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করেছে লেখক যে, জেসুপের ধারণাই সত্য। সেই পদ্ধতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বড় বড় মূর্তি এক জায়গায় গড়ে আরেক জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পত্র লেখকের কথায়, পাওয়ার অফ্ লেভিয়েশান শুধু বিজ্ঞান সম্মতই নয়, বাস্তব পৃথিবীতেও একদিন নিয়মিত সেই পদ্ধতির ব্যবহার ছিল।

যাই হোক চিঠিটা হারিয়ে ফেললেও বিষয় বস্তুটা ডক্টর জেসুপের মাথায় ঘোরে। চিঠিটাতে স্বাক্ষর ছিল কারলস্ মিগুয়েল এলেণ্ডের। ঠিক কোথা থেকে সুরু করবে, 'এই ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও জেসুপ ভেবেচিন্তে চিঠিটার উত্তর দেবে। যাতে পত্রলেখক আরো বিস্তারিত তথ্য ওকে পাঠায়।

কিন্তু লেখা, গবেষণা এবং লেকচার ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে জেসুপ এই সময়ে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে চিঠিটার কথা একরকম ভুলেই যায়। এই সময় ডক্টর জেসুপ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলে যে অ্যান্টি গ্রেভেটি সম্পর্কে টাকা পয়সা এবং সময় ইত্যাদি খরচ করে গবেষণা চালানোর সময় এসেছে। বিশেষ করে ইউ এস এ সরকার যখন ডক্টর আইনষ্টাইনের চিন্তাধারা ইউনিফাইড ফিল্ডের 'পেছনে জলের মত অর্থ খরচ করে চলেছে, তারচেয়ে অনেক কম টাকায়—পরিশ্রমে এবং সময়ে মহাকাশ যাত্রা সম্ভব। হ্যাঁ পরের দশকেই তা' সম্ভব হ'তে পারে।

ডক্টর জেসুপের অজ্ঞাতেই দর্শক হিসেবে এলেণ্ডে এইরকম একটা সভায় উপস্থিত থেকে ডক্টর জেসুপের বক্তৃতা শুনে আবার একটা চিঠি লেখে।

১৩ই জ'নুয়ারী, ১৯৫৬ সাল; ডক্টর জেসুপ তখন মিয়ামীতে। কারলস্ এলেণ্ডের চিঠিটা পেয়ে অবাক হয়ে যায়। এবারের চিঠিতে অবশ্য নিজের নাম কার্ল এম অ্যালেন বলে স্বাক্ষর করেছে। ঠিক আগের চিঠির স্টাইলে লেখা এবং পেনসিলভেনিয়া ডাকঘরের ছাপ মারা। চিঠির কাগজের মাথায় ছাপা অক্ষরে টারনার হোটেল, গাইনস্ভিলে, টেক্সাসের ঠিকানা। চিঠিটা হলো:

কারলস্ মিগুয়েল এলেণ্ডে
আর ডি নাম্বার: ১
বক্স: ২২৩
নিউ কেনিংস্টন, পেন্ন

প্রিয় ডক্টর জেসুপ,

আমি আপনার এক বক্তৃতায় উপস্থিত থেকে সব শুনেছি।

র অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর
রুদ্ধে এতো কথা বলার প্রয়োজন আছে বলে অন্তত আমি
ন করি না। কারণ ভালো চিকিৎসক অংক কষে চিকিৎসা
রে না। মানবত্বের দরুণই চিকিৎসা করতে বাধ্য হয়। নিজের
নকে খুশী করবার জন্যই তার এই প্রয়াস। এবং মানব সভ্য-
াকেও তার এই প্রয়াস এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে মানুষের
ধান চরিত্র এর বিরুদ্ধেই কাজ করে চলেছে। এবং ডক্টর বি
সলের মতই সম্ভবত ঠিক যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত
ষ তা-ই করে যাবে। আপনার হয়তো জানা নেই। ইতি
ধ্যে এমন একটা গবেষণা ইউ এস এ নেভী করছে যার দ্বারা
্রমাণিত হয় যে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী সঠিক। তবে নেভী
ার ফলাফল প্রকাশে ভীত। অবশ্য যাদের ওপরে এই পরীক্ষা
নরীক্ষা চালানো হয়েছিল, তাদের কারোরই এমন অবস্থা নেই
য তা' প্রকাশ করে। আমি আপনাকে আমার আগের চিঠিতে
চ্ছে করেই ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। লেভিটেসানের এমন
প হওয়া সম্ভব। কোন কোন ধাতু কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ
রনের প্রবাহের মধ্যে পড়লে বিশেষ রকমের কাজ করে থাকে।
দি ফ্যারাডে ইলেকৃট্রিক ফিল্ডকে ঘিরে ইলেকৃট্রিক্যাল প্রবাহ
মূহের ওপরে গবেষণা চালাতো, তবে হয়তো বা এতোদিনে
মামরা কেউ-ই আর বেঁচে থাকতাম না, আর যদি বেঁচেও থাকতাম,
াজকের মতো মৃত্যু আমাদের ঘিরে রাখতো না। ফলাফল হ'তো
মদৃশ্য জাহাজ বা যেটাকে ডেসট্রয়ার বলা যেতে পারে, তার
তো। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে সমুদ্রে যা অদৃশ্য হয়ে
গিয়েছিল নাবিকসহ। মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রটা প্রায় একশো গজের
তো সরে যায়। কিছুটা কম বেশী হ'তে পারে। কারণ চাঁদের
মবস্থান এবং রেখার ওপরে তা' নির্ভরশীল। জাহাজটার ওপরের
াবিকেরা অনুভব করতে পারে যে তারা শূন্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে।
কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

কেন আপনাকে এই কথাগুলো বললাম জানেন? সোজা

কথা। যদি কথাগুলো প্রকাশ করেন, আপনাকেও পাগল ব
প্রমাণিত করা হবে। সেই জাহাজের অর্দ্ধেক অফিসার এ
নাবিক এখনো বেঁচে রয়েছে। তাদের পাগল বলে একটা অন্ধক
আটকে রাখা হয়েছে।

ব্যাপারটা কি জানেন? মানুষগুলোকে জটিল এক যন্ত্রে
সাহায্যে ঠাণ্ডায় জমিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে শরীরে হাইফা
ফিল্ড তৈরী হয়। যখন মানুষটা জমে যায় তখন সময়ের জ্ঞা
বলতে তার আর কিছু থাকে না। ক্ষিদে, অনুভূতি ইত্যাদি
বৃত্তিগুলোও হারিয়ে ফেলে শূন্য এক পৃথিবীতে গিয়ে হাজি
হয়। প্রায় মাস কয়েকের মতো সময় লাগে স্বাভাবিক পৃথিবীতে
আবার ফিরে আসতে। জাহাজের বিশেষ ধরনের বার্থ আর প্রচুর
যন্ত্রপাতির দরকার হয় ব্যাপারটা ঘটাতে। যন্ত্রপাতিগুলোর দা
পড়ে আনুমানিক পাঁচশো কোটি টাকা। আপনি যদি বিস্তারিত
জানতে চান, খোঁজ করতে পারেন এই বিষয়ে।

অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে

কার্ল এম অ্যালেন

পুনঃ আমি যেখানে আছি, সেখানে এসে দেখা করলে আরো
বিস্তারিত বলতে পারি ( জেড ৪১৫১৭৫ )

অদৃশ্য জাহাজ? হারিয়ে যাওয়া নাবিকের দল? ব্যাপারটা
গাঁজাখুরি নয় তো! প্রথমে জেসুপের মনে হয়েছিল ওর উফো
ওপরে লেখা নিয়ে কেউ ঠাট্টা তামাশা করছে। অথবা, কোন
পাগলের লেখা চিঠি।

তবে জেসুপের মত কৌতূহলী লোক কোন কিছুকেই উড়িয়ে
দেয় না। হ'তে পারে সত্যি কোন ছোট্ট ঘটনার ওপরে রং
চড়ানো হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অনেক বিষয়ের ওপরেই
তো গবেষণা চালানো হয়েছে। ১৯৪৩ সালেই অণু-পরমাণু সম্পর্কে
চালাও গবেষণা চালানো হয়েছিল। যার পরিণতি সত্যিকারের
এটম বোমায়। আইনষ্টাইনের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লেখা একটা
চিঠি থেকেই তো সেই প্রজেক্টের জন্ম। এই খ্যাতিমান বৈজ্ঞানি

কের ইউনিফাইড ফিল্ডকে ঘিরেও হয়তো বা সেইরকম কোন বেষণা চালানো হয়েছিল। সফল হয়নি বলে লোকচক্ষুর অন্ত-লে তা থেকে গেছে। আর চিঠিটা যদি পুরোপুরি কাল্পনিক তো তবে নাম ঠিকানা ইত্যাদি দেবে কেন? কারণ বিস্তারিত ঠিতে তো পত্রলেখকের ছল তামাশা সব ধরা পড়ে যাবে। সুপ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

যাইহোক, এইবার জেসুপ পত্রলেখকের চিঠির উত্তর দেয়। সখানেক আবার চুপচাপ। জেসুপও নিজেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন াজে জড়িয়ে ফেলেছে। কিন্তু মাস পাঁচেক পরে আবার আগের তাই নিয়মিত চিঠির মধ্যে আগের দু'টোর চেয়েও হেঁয়ালি মাখা ার একটা চিঠি পায়।

তবে কি এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা এটা? নাকি ব থেকে বড় তামাশা?

## ॥ তিন ॥

ব্যাপারটার যবনিকাপাত যদি এইখানে ঘটতো, তবে সম্ভবত বচেয়ে খুশী হ'তো ডক্টর জেসুপ। কারণ মেক্সিকো অভিযান ায়ে তখন ডক্টর জেসুপ খুবই ব্যস্ত। আশা করছে সরকারের পক্ষে চিগান ইউনিভার্সিটির তরফে স্পনসারশিপ্‌ও জুটে যাবে।

ঘটনার সূত্রপাত কিন্তু ডক্টর জেসুপ চিঠি পাওয়ার বেশ কয়েক স আগেই হয়েছিল। এডমিরাল এন কার্থে, চীফ অফ দ্য অফিস ফ্ নেভেল রিসার্চ, ওয়াশিংটন ২৫ ডি সি আর মেজর এল টার একসঙ্গেই নেভেল রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করতো। হঠাৎ বেশ সড় ম্যানিলা রঙের একটা খাম পায়। অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে সেছিল। ভেতরে ডক্টর জেসুপের লেখা 'দ্য কেস্ ফর দ্য উফো' টার এককপি পেপারব্যাক সংস্করণ। সারা বইটার বিশেষ বিশেষ ায়গায় তিন রঙের কালি দিয়ে দাগ টানা। মার্জিনে মন্তব্য করা য়েছে, বইটার বিষয়বস্তু, পশ্চাৎপট এবং ইতিহাস নিয়ে। এবং এই

বইটা লেখার পেছনে লেখক যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে তা'তে সন্দে
নেই।

এডমিরাল ফার্থ ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেয় না। এম
কি বইটা খুলে পর্যন্ত দেখে না। কিন্তু মেজর রিটারের কৌতূহল জে
ওঠে। বইটা যে তৎক্ষণাৎ ওয়েস্ট পেপার বাক্সে ছুঁড়ে ে
দেওয়ার মতো নয় তা'তে সন্দেহ নেই। ফার্থের যখন কোন উৎসাহ-
নেই ব্যাপারটাতে, তখন মেজর রিটার বইটা নিজের কাছেই রে
দেয়। অবসর সময়ে আগাগোড়া পড়েও দেখে। ব্যাপারটা ও
হতভম্ব করে দেয়। মার্জিনে জেসুপের লেখা নিয়েই শুধু মন্তব্য নেই
জাহাজ, প্লেন বা মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া; অজ্ঞাত চিহ্ন বা পায়ে
ছাপ; টেলিপ্যাথি এবং কসমিক রে ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে
আলোচনা করা হয়েছে।

হয়তো বা মেজর রিটার জানতো যে ইউ এস এ নেভী অ্যা
গ্রেভেটি নিয়ে অতীতে গবেষণা চালিয়েছে। কারণ যাইহোক, রিটা
বইটা নষ্ট না করে যত্ন করে রেখে দেয়। পরে কমাণ্ডার ডব
হুবার এবং ক্যাপ্টেন সিডনী সারবের হাতে বইটা তুলে দেয়
কমাণ্ডার হুবার আর ক্যাপ্টেন সারবে তখন নেভীর প্রজেক্ট ভ্যানগা
যোগ দিয়েছে। প্রজেক্ট ভ্যানগার্ড হলো সাংকেতিক নাম। আস
এই ছদ্মনামের আড়ালে আমেরিকা তখন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রি
উপগ্রহ নির্মাণে ব্যস্ত। এবং বইটার অ্যান্টি গ্রেভেটি সম্প
অনেক কথা থাকায় দু'জনেই বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়ে প
ব্যাপারটাতে। হুবার তো বইটার মার্জিনের দুর্বোধ্য লেখাগুলে
উদ্ধারে এতো উৎসাহিত হয়ে পড়ে যে প্রজেক্টের কাজকর্ম প্রায় শিকে
তুলে দিয়ে তার পেছনেই দিনরাত ডুবে থাকে। বিস্ময়
ব্যাপারটাতে সারবেও উৎসাহিত কম হয় না। ১৯৫৭ সা
ওরা ডক্টর জেসুপকে নেভেল রিসার্চের ওয়াশিংটনের অফিসে আমন্ত্র
জানায়। সবাই মিলে আলোচনা করা যাবে বলে।

জেসুপ নেভেল রিসার্চের অফিসে পৌঁছলে তার হাতে মার্জিনে
মন্তব্যসহ বইটা তুলে দিয়ে, বইটা কিভাবে ওদের হাতে এসেছে সে

সম্পর্কেও বিস্তারিত বলে হুবার আর সারবে। সেটা আঠারো মাস আগে মেজর রিটার আর এডমিরাল ফার্থের হাতে এসেছিল।

মার্জিনের মন্তব্য পড়ে ডক্টর জেস্থপ তো অবাক। উল্লেখ করা ঘটনাগুলো বইটা প্রকাশিত হওয়ার পরে ওর কানে এসেছিল, কিন্তু কোন বইয়ে ডক্টর জেস্থপ সেগুলোর উল্লেখ করেনি। সবচেয়ে বড় কথা, যে মার্জিনে লিখেছে, তার জ্ঞান যে উফো সম্পর্কে ওর চেয়ে অনেক বেশী সে বিষয়ে এতোটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। কথাগুলো নিখুঁত কিনা তা' বড় কথা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা লেখকের অনেক বেশী বিস্তারিত আর গোড়া থেকে জানা।

জেস্থপ যেন অথৈ জলে পড়ে। কে হতে পারে? কয়েক পাতা পড়ার পর দেখতে পায় ১৯৪৩ সালের একটা নেভেল প্রজেক্টের কথা বলা হয়েছে। যার সাহায্যে নাকি একটা জাহাজকে অদৃশ্য করা হয়েছিল। এবার আর জেস্থপের সন্দেহ থাকে না। সেই হুটো চিঠি ও যার কাছ থেকে পেয়েছিল, মার্জিনের মন্তব্যও সেই লিখেছে। সেই কথাটা ওদের বললে পরে হুবার উত্তর দেয়—আমাদের কি দয়া করে চিঠির কপি হুটো দেখাতে পারেন?

জেস্থপের অবশ্য চিঠি হুটোর কপি না দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। আর ডক্টর জেস্থপের বইয়ের সীমাবদ্ধ কয়েকটা কপি ভ্যানগার্ড প্রজেক্টের উপর মহলের সব অফিসারকেই পড়ার জন্য দেওয়া হয়।

কিন্তু এই ঘটনার পরেই ডক্টর জেস্থপের জীবনে হঠাৎ কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। বিশ্রী রকমের এক মোটর হুর্ঘটনায় আহত হয়ে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়। এতো বছরের শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবনেও ফাটল দেখা দেয়। অবশ্য এরপর ডক্টর জেস্থপ যতোদিন বেঁচে ছিল সুস্থ আগের জীবনে আর ফিরে যেতে পারেনি।

যাইহোক, ইতিমধ্যে হুবার আর সারবের মধ্যে একজন কারলস্ এলেণ্ডকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। হুবার জেস্থপকে চিঠিতে এলেণ্ডের যে ঠিকানা দিয়েছিল পেনসিলভেনিয়ার সেই ঠিকানায় এসে

খোঁজ করে দেখে ঠিকানাটা এলেঙেও ঠিক দেয় নি। অনেকভাবে খোঁজ করেও এলেঙের হদিস পাওয়া যায় না। মনে হয় লোকটাই বোধহয় ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডক্টর জেস্থপের একবন্ধুও ওর অনুরোধে চিঠিতে দেওয়া ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয় এক পরিত্যক্ত খামার বাড়ীতে। আশে পাশের প্রতিবেশীরা জানায় প্রৌঢ় এক দম্পতির সঙ্গে কারলস্ অথবা কার্ল বলে একটা লোক কিছু দিনের জন্য খামার বাড়ীতে ছিল। কিন্তু বেশ কয়েকদিন আগে ভোর সকালে খামার বাড়ীতে একটা ট্রাক আসে। সেই ট্রাকে মালপত্র বোঝাই করে নিয়ে সেই প্রৌঢ় দম্পতি আর কারলস্ চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

এদিকে নেভেল রিসার্চের অফিস-টফিস ঘুরে এসে ডক্টর জেস্থপের মনের ভেতরেও একটা চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে। একেবারে কিছু না থাকলে বিষয়টাকে নিয়ে নেভেল রিসার্চ এতো মাথা ঘামাচ্ছে কেন? সুতরাং আরো বেশী উৎসাহ নিয়ে ব্যাপারটার খোঁজখবর করা উচিত।

১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যখন মেক্সিকো অভিযানের জন্য টাকা দিতে অস্বীকার করে তখন জেস্থপ এসব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে লেখায় এবং প্রকাশনার ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করবে বলে মনস্থির করে। রোজগার কম হলেও টাকার তেমন বেশী একটা প্রয়োজনও ওর ফুরিয়েছে। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে এদিক ওদিক চাকরী টাকরী বা স্বামীর ঘর করতে চলে গেছে। বৌও ইতিমধ্যে ছেড়ে গেছে ওকে। সুতরাং সংসারে মানুষ বলতে তো ও একা। এইসব ভেবে মিয়ামী শহরের ঠিক বাইরে ওর বিরাট বড় বাড়ীটা বিক্রী করে দিয়ে নিজের দেশ ইণ্ডিয়ানায় ফিরে যায়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ঘটনার গতি পরিণতির দিকে এগোয়। জেস্থপ ইণ্ডিয়ানা থেকে নিউইয়র্কে গিয়েছিল কয়েক-জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। এর আগেও অনেকবারই ইণ্ডিয়ানা থেকে নিউ ইয়র্কে যাতায়াত করেছে। কে জানতো এটাই ওর শেষ যাত্রা।

নিউইয়র্কে বন্ধু ইভান্‌টি স্যানডারসনের বাড়ীতে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে জেসুপেরও ডিনারে নিমন্ত্রণ ছিল। ডিনার শেষ হওয়ার পরে জেসুপ গৃহস্বামীসহ তিন বন্ধুর সঙ্গে আরো গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সকলেই রাজী হয়। একথা সেকথার পর জেসুপ মার্জিনে মন্তব্য লেখা বইটা স্যান্‌ডারসনের হাতে দিয়ে অনুরোধ করে কাউকে যেন স্যান্‌ডারসন ব্যাপারটা না বলে। স্যান্‌ডারসন ১৯৭৩ সালে মারা যায়। মৃত্যুর পরেও বইটা আর খুঁজে পাওয়া যায়না। সেইদিন কথা প্রসঙ্গে জেসুপ নাকি বন্ধুকে বলেছিল যে ও সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে। ওর জীবনের মোড়ও যে সেই দিকেই ঘুরছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বন্ধুরাও ঘটনাটাতে অবাক না হয়ে পারে নি। বরাবরই জেসুপকে দেখতো ঘর গেরস্থালীর প্রতিটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে। এককথায় যাকে বলা যায় বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকলেও জেসুপ ঘোরতর সংসারী মানুষ। এমন কি নাতিদের ভবিষ্যত সম্পর্কেও জেসুপ নিয়মিত চিন্তাভাবনা করতো। আর সেই লোকটাই কেমন যেন হয়ে গেল। এটা কি হঠাৎ কোন ঘটনা যা ওর পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনটাকে তছনছ করে দিয়েছে? নাকি—।

জেসুপের কয়েকদিন পরেই নিউ ইয়র্ক থেকে ইণ্ডিয়ানায় ফেরার কথা ছিল। বেশ কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরে ওর ইণ্ডিয়ানার প্রকাশক নিউ ইয়র্কে খোঁজখবর করতে শুরু করে জানতে পারে যে স্যানডারসনের বাড়ীর ডিনার পার্টির দু একদিনের মধ্যে ও ইণ্ডিয়ানায় ফেরার জন্য নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করার পরেও জেসুপ যখন ইণ্ডিয়ানায় ফেরে না, বন্ধুরা এবার ওর নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক ছাড়ার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জানতে পারে জেসুপ ফ্লোরিডায় গেছে। এবং সেখানে ভীষণ রকমের একটা মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী।

পরের ক'মাসের খবর বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। হতাশা

যেন তখন ওকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে উদ্যত। মোটর দুর্ঘটনার পরে হতাশাটা যেন আরো বেশী চেপে ধরে।

১৯৫৯ এ্যালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। উনষাটতম জন্মদিনের তখন আর মাস দুয়েক বাকী, জেস্নুপ নিজের মনটাকে স্থির করে ফেলে নিউ ইয়র্কের টেলিভিসানের 'টক—ফে'র অধিকর্তা লঙ্‌ জন নোয়েলকে যে চিঠি লেখে, সেটাকে আত্মহত্যার নোটিশ বলাই সঙ্গত। নোয়েলের কাছে সে লেখে : এই বিষাদময় পৃথিবী ছেড়ে অন্য পৃথিবীতে চলে যাওয়াই ভালো। অনেক ভেবে চিন্তে মনস্থির করে তবেই এই ধারণায় এসেছি। হঠাৎ হতাশার ফলশ্রুতি এটা নয়।

ওর শেষ ইচ্ছেও নোয়েলকে জানিয়েছিল জেস্নুপ সেই চিঠিতে। টেলিভিসানের সাহায্যে যেন ওর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে নোয়েল। কিন্তু ওর উকিল সেই চেষ্টা করতে দেয় নি। কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা আমেরিকার আইনে নেই। ২০শে এপ্রিল ১৯৫৯ সালে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় আরো দুটো চিঠি লেখে ডক্টর জেস্নুপ। পরে ওর গাড়ীর চাকার তলায় চিঠি দুটো দলামোচড় অবস্থায় পাওয়া যায়। গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করে হোস্‌ পাইপের সাহায্যে কার্বন মনো অক্‌সাইড নিয়ে এসেছিল ডক্টর জেস্নুপ গাড়ীর ভেতরের কেবিনে। জানালগুলো শক্ত করে এঁটে দিয়েছিল। মনো অক্‌সাইডের বিষে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই ডকটর জেস্নুপের মৃত্যু হয়।

## ॥ চার ॥

তা'হলে ফিলাডেলফিয়া এক্‌স্‌পেরিমেন্ট কি সত্যি সত্যি ঘটেছিল? ডক্টর জেস্নুপের মৃত্যুর পরে ব্যাপারটায় যেন আরো বেশী করে লোকে উৎসাহ প্রকাশ করতে শুরু করে। নতুন নতুন খবরও এসে তাতে ইন্ধন জোগায়। কিন্তু রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টার ব্যাপারে ডক্টর জেস্নুপ প্রাণপুরুষ থাকার পর ওর মৃত্যুতে সাময়িক-

ভাবে যেন কিছুটা ভাটাও পড়ে। তবে নিছক রূপকথা বলে তো ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৃথিবীতে এমন অনেক শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান, যার খোঁজখবর এখনো মানুষের অজানা। বিশেষ করে ছবার আর সাররের উৎসাহ দেখে মনে হয় অ্যান্টি গ্রেভেটি ব্যাপারটার তত্ত্বগত দিক বিচার বিবেচনা করেই ওরা কাজে নেমেছিল। বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞার তত্ত্বের দিকটা বিচার করলে ব্যাপারটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

স্বীকার করতে বাধা নেই যে আইনষ্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী এখনো পর্যন্ত খুব কম লোকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব হয়েছে। স্বভাবতই থিয়োরীটাকে ঘিরে তাই রহস্যের জটও কম পাকানো নেই। সেইভাবে দেখতে গেলে পরমাণুবিক শক্তির উন্নতির মূলে ছিল আইনষ্টাইনের আরেকটা থিয়োরী : $E=mc^2$। সেটাই বা ক'টা লোক বুঝতে পেরেছিল! হ্যাঁ, যতোক্ষণ না পর্যন্ত এই পরমাণুবিক থিয়োরীটার সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়। ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীও হয়তো বা ভবিষ্যতে কোনদিন সফল প্রয়োগের আশা রাখে। তখন রহস্যের পাকানো জটও নিজে থেকেই খুলে যাবে। কে বলতে পারে হয়তো নেভী চেষ্টা করতে করতে ওদের অজ্ঞাতেই থিয়োরীটার প্রয়োগ হয়ে গেছে। কয়েক মিনিটের জন্য শক্তি ক্ষেত্রটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে শক্ত বস্তুর তাৎক্ষণিক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই সরে যাওয়া। ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর লক্ষ্যও তো তাই। হয়তো বা এই তত্ত্বের আলোতেই বারমুডা ট্রাঙ্গলে যে জাহাজ প্লেন ইত্যাদি নিখোঁজ হয়ে চলেছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। হয়তো বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক মেঘের দলই তার জন্য দায়ী। এমনও কি হওয়া সম্ভব নয় যে ওইসব জাহাজ প্লেনগুলো গিয়ে সময়কে আঘাত করে এবং তাদের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু সেই যাত্রা গিয়ে দাঁড়ায় অনন্ত যাত্রায়। অথবা টাইম এবং স্পেসের মধ্যে কি অন্য কোন ডাইমেনসান আত্মগোপন করে আছে! বা, এটাই হলো শক্তির সবচেয়ে সস্তার উৎস। নিখরচায় দূর দূরান্তের

ইউনিফাইড্ ফিলড থিয়োরীর সার্থক প্রয়োগ হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীকে ভয়াবহ কোন মারণাস্ত্রের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। যার ক্ষমতা আজ মানুষের কল্পনায় আনাও সম্ভব নয়। সীমাহীন সেই সম্ভাবনা।

কিন্তু আগের চিঠিগুলোর মধ্যে কি কোন সত্যতা লুকিয়ে আছে! এই ব্যাপারে তিনটে সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, জাহাজ নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট, এলেণ্ডের চিঠি আর এলেণ্ডে স্বয়ং -আর কিছু নয় মানুষের বিশ্বাসের জগতে বিরাট বড় একটা জালিয়াতি। দ্বিতীয়ত, এমন ঘটনা হয়তো সত্যি-ই ঘটেছে যার হুবহু বর্ণনা চিঠিতে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় হলো, হয়তো বা ছোট একটা ঘটনার ওপরেই কল্পনার রঙ এলোপাথাড়ি চড়িয়ে ঘটনার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন কথা হলো—আমরা যদি প্রথমটাকে ধরে নেই, তবে সেটা চোখ বন্ধ করার কাজ হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য তাহলে ব্যাপারটার এখানেই যবনিকাপাত হওয়া উচিত। পুরো ঘটনাটাকেই জালিয়াতি বলে ধরে নিয়ে এগোনোর কোন মানে হয় না। সন্দেহ প্রবণ মন কোন সত্য থাকলেও তা' খুঁজে পাবে না।

তবে এলেণ্ডের চিঠি দু'টো বিশ্লেষণ করলে পরে ব্যাপারটায় যথেষ্ট পরিমাণেই সূত্র পাওয়া যায়। এবং বৈজ্ঞানিকরা তো গোড়ার কয়েকটা সূত্র ধরেই কোন কাজে এগিয়ে থাকে। অবশ্য প্রজেক্টের কাজটা সঠিক কোথায় শুরু করা হয়েছিল তা জানা যায় না। একটা অংশ যে ফিলাডেলফিয়া নেভেল ইয়ার্ডে করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। আর কি নামে নেভী এই গবেষণা চালিয়েছিল, তা' না জানায় গবেষণাটার নামকরণ করা হয়েছে ফিলা-ডেলফিয়া একসপেরিমেন্ট। হয়তো বা ডক্টর জেস্সুপ বা তার আগের কোন বৈজ্ঞানিকের দেওয়া নাম এটা। যাইহোক, এলেণ্ডের চিঠিতে দেওয়া তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা যাক। ডক্টর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর তত্ত্বগত কাজ ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে যে সম্পূর্ণ করেছিলেন তা প্রমাণিত সত্য। তবে ইউনি-

ফাইড ফিল্ড থিয়োরী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ করেন নি। এর একমাত্র কারণ আইনস্টাইন এই থিয়োরীর প্রয়োগের প্রচণ্ড ভয়াবহতার দিকটা অনুমান করতে পেরেই এই কাজ থেকে বিরত ছিলেন। এলেণ্ডের মতে ডক্টর বি রাসেলের থেকে কথাটার সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। এখানে ডক্টর বি রাসেল বলতে সম্ভবত এলেণ্ডে ডক্টর বার্ট্রেণ্ড রাসেলের কথাই বলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই রাসেলের সঙ্গে আইনষ্টাইনের বন্ধুত্বের কথা সবাই জানে। একান্তে তাদের অনেক গোপন আলোচনাও হয়েছে। সেইসময় আইনষ্টাইন হয়তো বা ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী এবং এর ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথাও রাসেলকে বলে থাকবেন। এবং মানবত্বের পূজারী রাসেলই সম্ভবত আইনষ্টাইনকে সেই সময় এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা না চালানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর তত্ত্বগত দিকটাকে নিয়ে কম নাড়া চাড়া করা হয় নি। বিশেষ করে নেভীর ভূমিকাই ওই বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিল। এর একমাত্র কারণ হলো জ্বালানির সাশ্রয় খোঁজা। কারণ তখন নিদারুণ জ্বালানির অভাব চলছে। এলেণ্ডের চিঠিতে যাকে আমার বন্ধু বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ডক্টর ফ্রাংকলিন রেনোর ভূমিকা এই ব্যাপারে কিছু কম ছিল না। ফলাফলের লোভ তার চোখে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী রীতিমতো মায়া-কাজল পরিয়ে দিয়েছিল।

এই ফলাফল হলো ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ডেসট্রয়ার টাইপ-জাহাজটার চারপাশে কোন প্রকার শক্তির সাহায্যে বা শক্তিক্ষেত্র তৈরী করে জাহাজটাকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে দেওয়া। জাহাজের ওপরের নাবিকরা পরস্পর পরস্পরকে আবছা দেখতে পেলেও সেই শক্তি-ক্ষেত্রের বাইরে কোন কিছুই তাদের নজরে আসে না। অদৃশ্যতা তৈরীর শক্তিক্ষেত্রের ফলাফল এলেণ্ডের মতে জড়িত মানুষগুলোর ক্ষেত্রে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। একস্পেরিমেন্ট সফল হলেও মানুষের বিফলতার তুলনা নেই।

ফিলাডেলফিয়া নেভেল ইয়ার্ডে ওই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী বার্থের সন্ধানও পাওয়া গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যা তৈরী করা হয়েছিল। পরে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ার সংবাদপত্রে একবার ছোট একটা সংবাদ প্রকাশ করা হয়। স্থানীয় একটা বারে ভয়েজ থেকে ফিরে নাবিকের দল এমন উন্মত্তের মতো আচার আচরণ করতে শুরু করে যে বারের কর্মচারীরা বার ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। হয়তো বা নাবিকদের মধ্যে সেই শক্তির রেশ অল্প পরিমাণে রয়ে গেছে। একজন বারের কর্মচারী তো টহলদারী তীরের পুলিশ ডাকতে ছোটে। কয়েকজন সাংবাদিক সেখানে এসে হাজির হয়। বলাবাহুল্য, বারের নাবিকদের গল্প তখন সেই সাংবাদিকরা গাঁজাখুরি বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল।

এলেণ্ডে দাবী করেছে সে মাটসন লাইনের লিবার্টি শিপ্ এস এস এলড্রু ফুরুসেথের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। জাহাজটা নরফোল্ক থেকে ফিলাডেলফিয়ার দিকে আসছিল। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা এটা। এলেণ্ডের সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে আরো কয়েকজন প্রত্যক্ষ করছিল এক্স্পেরিমেণ্টটা। তাদের মধ্যে চীফ্ মেটস্লে, রিসার্চ শিপ্রলিসে প্রাইসও ছিল। প্রাইসের বয়স তখন আঠারো উনিশ বছর। রোনোকে ভার্জিনিয়া থেকে আগত। আরেকজনের নাম উল্লেখ করেছে এলেণ্ডে। নিউ ইংল্যাণ্ডের কনালী। সম্ভবত লোকটা বোসটন থেকে এসেছিল।

রেয়ার এডমিরাল রাউসন বেনেট্, চীফ নেভেল রিসার্চ সম্ভবত ঘটনার ওপরে সত্যিকারের আলো আরো বেশী পরিমাণে ফেলতে পারতো।

যে জাহাজটার ওপরে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, রহস্যময়ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া থেকে সেটা নরফোল্ক বন্দরে হাজির হয়। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এলেণ্ডে এই সময়ের দীর্ঘত্ব জানতে পারে ১৯৪৬ সালে। এক্স্পেরিমেন্ট পরিত্যক্ত ওয়ার অনেক পরে

এলেণ্ডে চিঠিতে জানিয়েছে ১৯৫৬ সালে গোপন এক চিঠিতে বার্ক, চীফ অফ দ্য অফিস অফ দ্য নেভেল রিসার্চকে জানানো হয় যে শক্তিক্ষেত্রকে নিয়ে একটা একস্‌পেরিমেন্ট সত্য-ই করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা' সত্বর পরিত্যক্ত করা হয়। এলেণ্ডের চিঠি অনুসারে বার্ক এই একস্‌পেরিমেন্টের বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল।

শেষমেষ এলেণ্ডে তার তৎকালীন ঠিকানাসহ ডক্টর জেসুপকে কিছু তথ্য সরবরাহ করে ; ওর ধারণায় সেই Z নম্বর ছিল ও যে জাহাজে যাচ্ছিলো তার নাবিকদের নাম্বার। Z ৪১৭১৭। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় এলেণ্ডে প্রায় ছ'মাস এস এস ফুরুসেথ জাহাজে নাবিকের চাকুরী করেছিল।

সুতরাং বিনা দ্বিধায় বলা চলে, এই ধরনের একটা একস্‌পেরিমেন্ট করা হয়েছিল। তবে আরো তথ্য খুঁজে বার করার আবশ্যকতা রয়ে গেছে।

সত্যাই কি তাহলে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট করা হয়েছিল ? যদি করা হয়েই থাকে, তবে কি ধরনের শক্তি সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল ? সেই শক্তি ব্যবহারেই কি উফো-বিচিত্র আকাশযান-মহাজাগতিক বাসিন্দারা চালু রেখেছে ?

এই ব্যাপারে এলেণ্ডের চিঠির শেষের মন্তব্যটাকে মেনে নেওয়া যেতে পারে, হয়তো বা নেভীর সবার অজ্ঞাতেই একস্‌পেরিমেন্ট চালাতে গিয়ে এই ধরনের হঠাৎ এক অজানা শক্তির অভ্যুদয় হয়ে পড়েছিল। তবে তার আগে প্রয়োজন রহস্যময় সেই পুরুষ সিনিয়োর কারলস্‌ মিগুয়েল এলেণ্ডে সম্পর্কে আরো বেশী খোঁজখবর নেওয়া।

## // পাঁচ //

অনেক বৈজ্ঞানিকই এলেণ্ডের চিঠির জট ছাড়াতে চেষ্টা করলেও প্রধান বাধা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে কারলস্‌ এলেণ্ডে স্বয়ং। এলেণ্ডেকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করে ওর অভিজ্ঞতা যদি

পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে পারা যায় তবে সমস্যাটির সমাধানের পথে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু সেই এলেণ্ডেকে ধরাটাই যেন অসম্ভব একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারণ ১৯৬০ সালের পর থেকে হঠাৎ অনেক জাল এলেণ্ডের উদয় হয়। মোটা টাকার বিনিময়ে ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের মিথ্যা বিবরণ বিক্রী করাটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। একজন তো আবার এগিয়ে গিয়ে নিউ কেনিংসটন ডাকঘরের ছাপ মারা চিঠি পাঠাতে শুরু করে। নিউ কেনিংসটন সম্ভবত সত্যিকারের এলেণ্ডের হোমটাউন ছিল। ভাগ্যই বলতে হবে, ফিলাডেলফিয়া এক্স-পেরিমেন্টে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকরা তাদের কথায় ভোলে না। অনেকে আবার এও ভাবে যে সত্যিকারের কারলস্ বলে কেউ নেই, নেভীর গোয়েন্দা দপ্তর-ই উফো রিসার্চের বেসরকারী উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে।

তবে এলেণ্ডেকে খুজে বার করার পথে হাজারো সমস্যা এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একে তো বিভিন্ন শহরের এব গ্রামের টেলিফোন ডাইরেক্টরী, মিলিটারী, নেভেল এবং মাচেণ্ট জাহাজগুলোর নথিপত্র, পুলিশ এবং সংবাদপত্রের পুরনো ফাইল ইত্যাদি খোঁজাখুজির জন্য প্রচুর সময়ের দরকার। তবে সন্দেহ নিরসন করতে হলে এই পরিশ্রমটাকেও তো ন্যায্য পাওনা বলে স্বীকার করে নিতেই হয়।

প্রথমেই কিম্ লোরেনজেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। লোরেনজেন টিউক্সনের আরিজোনার এরিয়াল ফেনোমেনান রিসার্চ অর্গানাইজেসনের ডিরেক্টর। লোরেনজেন বলে যে এ পি আর ওর জার্নালে ১৯৫৯ সালে রহস্যময় এলেণ্ডে সম্পর্কে একটানা লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরে এ পি ওর হেড কোয়ার্টারে নিজেকে এলেণ্ডে বলে পরিচয় দিয়ে একজন লোক এসে উপস্থিত হয়। এবং ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেণ্ট ব্যাপারে লোকটা সত্যতা স্বীকারও করে। লোরেনজেন লোকটার একটা ছবিও পাঠিয়ে দেয়। তবে এর বেশী কিছু বলা লোরেনজেনের পক্ষে সম্ভব হয় না; কারণ লোকটা লোরেনজেনের সঙ্গে আর দেখা করে নি

বা যোগাযোগ করার জন্য কোনরকম ঠিকানাও রেখে যায় নি। এর কিছু দিন পরেই সেই লোকটার কাছ থেকে লোরেনজেন আবার একটা পোষ্ট কার্ড পায়। এবার অবশ্য ঠিকানা দেওয়া ছিল।

এলেণ্ডেকে খুঁজে বার করা ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্টের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রথম ধাপ। কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসুবিধে হয়ে পড়ে যে ফিলাডেলফিয়া একসপেরিমেন্ট সম্পর্কে সত্যিকারের প্রশ্নের হদিশ পাওয়া। যদিও যোগাযোগ রাখার জন্য তথাকথিত কারলস্‌ এলেণ্ডের সঙ্গে প্রচুর চিঠিপত্রের লেনদেন, দীর্ঘ সময় ধরে টেলিমাধ্যমে কথাবার্তা এবং কয়েকবার মুখোমুখি দেখাও হয়েছে, তবে এতোসবের পরেও বলা সম্ভব হয় না সে সত্যিকারের এলেণ্ডে কিনা।

প্রায় ছ'ফুট লম্ব, মাথায় টাক, চোখে চশমা আর বেশীরভাগ সময়েই নোংরা জামাকাপড় পরা। চোখের তারায় সবসময়ই সন্দেহের একটা ঝিলিক আর মাঝে মধ্যে মুখে টেনে আনে মৃদু হাসি ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট ছাড়াও লোকটা আরো অনেক অদ্ভুত বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। তবে ফিলাডেলফিয় একসপেরিমেন্ট নিয়ে যখন কথাবার্তা চলে, তখন বোঝা যায় অনেক কথা ও ইচ্ছে করেই আড়ালে রাখছে। এই বিষয়ে সোজাসুজি প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যায়। জোরাজরি করলে পরে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট নিয়ে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে অন্য বিষয়ের অবতারণা করে; নির্দিষ্ট সময় এবং তারিখ দিয়েও পরে সেই তারিখ আর সময় মতো আসে না; হঠাৎ আবার এসে একদিন হাজির হয়।

তবে প্রকৃত এলেণ্ডে কে? আরো পাঁচ জন তো নিজেদের এলেণ্ডে বলে দাবী করছে। অবশ্য এই সেই ব্যক্তি যে ডক্টর জেস্থপের সঙ্গে চিঠিপত্রের চালাচালি করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডক্টর জেস্থপের কাছে লেখা চিঠিগুলো আর ওর হাতের লেখা এক। ১৯৫৬ সালে ডক্টর জেস্থপের কাছে লেখা পোষ্ট কার্ডটা যে এই ব্যক্তিরই লেখা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। তবে বাকীটার পুরোপুরি সন্দেহের নিরসন

তখনো হয় নি। দুটো ব্যাপারে যে সত্যিকারের এলেণ্ডের সঙ্গে এর মিল বর্তমান, সে কথা জোর দিয়েই বলা চলে।

কারলস্ এলেণ্ডের নিজের দেওয়া পরিচয় থেকে জানতে পারা যায় যে ছোটবেলায় ওর নাম ছিল কার্ল অ্যালেন। বাবা আইরিশ আর মা ছিল জিপ্সী। তিন সন্তানের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো কার্ল। ৩১শে মে, ১৯২৫ সালে ছোট পেনসিলভেনিয়া শহরের বাইরে এক খামার বাড়ীতে ওর জন্ম হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় নিউ কেনিংসটনে নয়। ছেলেবেলার কথা ওর মুখ থেকে খুব বেশী একটা বার করা সম্ভব হয় না। শুধু জানা যায় পুরো পরিবারটা এক খামার বাড়ীতে বাস করতো আর ন'বছর স্কুলে পড়ার পর কার্ল স্কুল ছেড়ে দেয়। খুব চঞ্চল আর মেজাজী ছিল এই কার্ল। তবে বইয়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে আনন্দ পেতো।

১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই, ওর সপ্তদশ জন্মদিনের ছ' সপ্তাহ পরে খামার বাড়ীর জীবনযাত্রা ত্যাগ করে ম্যারাইন করপ্স্-এ যে কোন চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। চালর্সটন, ক্যারোলিনায় দশ মাস চাকরী করার পর ২১শে মে, ১৯৪৩ সালে ওকে সেই চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ হিসাবে দেখানো হয়—মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়েছে চাকরীর পক্ষে ওর শারীরিক অসুস্থতার কথা। দেশের বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য ঘুরে এসে ও সোজা চলে যায় ফিলাডেলফিয়াতে। সেই বছরের জুলাই মাসে চাকরীর জন্য মার্চেন্ট নেভীতে নাম লেখায়। কয়েকদিন পরে কর্তৃপক্ষ ওকে নিউ হফ্‌ম্যান আইল্যাণ্ডে নাবিকদের ট্রেনিং স্কুলে যোগদানের আদেশ দেয়।

ওর প্রথম চাকরী হয় কিপ্ মাষ্টার ডবলু এস ডজের অধীনে এস এস এনড্রু ফুরুসেথ জাহাজে ডেক সারেঙ হিসেবে। আমরা ওর জীবনের এই অধ্যায়টা সম্পর্কেই আগ্রহী। লিবার্টি শিপ্টি ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩ সালে নরফোল্ক বন্দর থেকে নর্থ আফ্রিকার কাসাব্লাংকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেই জাহাজে এলেণ্ডে ছিল প্রায় মাস পাঁচেকের ওপর। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে ফুরুসেথ ছেড়ে দিয়ে এস এস নিউটন ডি বেকার জাহাজে সারেঙ হিসেবে যোগ

দেয়। এই সময়েই ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট সংঘটিত হয়েছিল।

আটলান্টিক এবং প্যাসিফিক মহাসাগরের বুকে ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রায় সাতাশটা বকমারী জাহাজে চাকরী করেছে। পরে সীম্যান ইউনিয়নের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে জাহাজের চাকরী বরাবরের মতো ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের খোঁজে ডাঙ্গায় উঠে আসে এলেণ্ডে।

এর বাইরে লোকটার জীবন কিন্তু রহস্যে ঢাকা। ডক্টর জেস্থপকে চিঠি লিখে, এ পি আর ও'র কাছে স্বীকারোক্তি করে পুরোপুরি জিপসী কায়দায় আমেরিকা এবং পৃথিবীকে অবাক করে দেয়। যে কোন রকমের চাকরী এবং পড়াশোনাও সম্ভবত এই একই কারণে চালিয়ে গেছে। স্বীকার করতে আপত্তি নেই বৃহৎ পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ দেখার সুযোগ ও এইভাবেই পায়। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি তৈলকূপ খননের কাজ নিয়ে টেক্সাসের পশ্চিমাঞ্চল এবং নিউ মেক্সিকোর পূর্বাঞ্চল ঘুরে বেড়ায়। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায় এডমিরাল ফ্রথ যখন মার্জিনে মন্তব্য লেখা বইটা পায়, তখন সে সত্যি টেক্সাসে ছিল টেকসাসের গাইনেস ভিলেতেও লোকটা বসবাস করেছে ঠিক সেই সময়েই ডক্টর জেস্থপ এলেণ্ডের দ্বিতীয় চিঠিটা পায়। সুতরাং দেখা যায় উভয় ঘটনাস্থলই ওর দেওয়া ঠিকানার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

চরিত্রগতভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট লোকটা, নেভী এবং অন্যেরা ওর সম্পর্কে খোঁজখবর করতে আরম্ভ করলে, ভয় পেয়ে বেশ কয়েক বছরের জন্য আত্মগোপন করে। শেষে গিয়ে ওর খোঁজ মেলে সাউথ সেন্ট্রাল মেক্সিকোর লস্ হলটস্ অঞ্চলে। এখানেই পাকাপাকি ভাবে বসবাস করার কথা ভাবছিল লোকটা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ডক্টর জেস্থপ মেক্সিকোর এই অঞ্চলেই রহস্যময় আগ্নেয়াগিরির খাদমুখগুলোকে খুঁজে পেয়েছিল। লোকটা নাকি বরাবরই ওখানে বাস করতেন সেই অঞ্চলের একদল জিপসীর সঙ্গে। যারা ওর নাম কার্ল অ্যালেনকে মেক্সিকোর ভাষায় কারলস্

মিগুয়েল এলেণ্ডেতে পরিবর্তিত করেছিল। এখনো এলেংে মেক্সিকোর সেই অঞ্চলেই বসবাস করছে। লোকটার জীবন এতোই রহস্যময় যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে।

কারলস্ এলেণ্ডের দেওয়া ঠিকানা ছিল নিউ কেনিংসটন, পেনসিলভেনিয়া। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় ১৮৫০ সালে প্রথম এবং মধ্যভাগে সত্যই একটা এলেণ্ডে পরিবার পেনসিলভেনিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করতো।

মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এলেণ্ডে নামধারী দুই ভাই কাজকর্মের খোঁজে পুয়েরতো রিকো থেকে আমেরিকায় এসেছিল। পুরোপুরি ব্যাপারটা জানার আর উপায় নেই। তবে বড় ভাই পেড্রো যখন কেয়ারটনে বাস করতো, শুনতে পায় যে পুয়েরতো রিকোর কোন এক মিসেস ক্লকসন শহরতলী পিট্‌বুর্গের সিভিকলে বসবাস করছে। হয়তো বা ভদ্রমহিলা ওর কাজকর্মের ব্যাপারে কোন সুরাহা করে দিতে পারবে ভেবে পেড্রো মহিলার সঙ্গে দেখা করে নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে। মিসেস ক্লকসন সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত দুটো দেখতে চায় কর্মঠ হাত দু'টো দেখে ওর জন্য একটা কাজও জুটিয়ে দেয়। পেড্রো বৌ ছেলেপুলে নিয়ে অ্যালিপো টাউনশিপের গ্রীনফিল্ড পেনসিলভেনিয়াতে ছোট্ট একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে থাকে। পেড্রোর সন্তানদের মধ্যে অ্যালেন নামে একজন এখনো বেঁচে আছে। কয়েক মাস পরে টাকা পয়সা জমিয়ে নিজে একটা বাড়ী কেনে পেড্রো।

এই সময়ে ওর ছোটভাই ফিলোসিটো বা ফিলো এসে হাজির হয়। ঘটনার সূত্রপাত এই সময় থেকেই। মিসেস ক্লকসনের মতে দু'ই ভাই-ই এসেছিল পুয়েরতো রিকোর হাটো রে নামের গঞ্জশহর থেকে। কোমিরিও নদীর কাছের এক জলপ্রপাতের নিকটবর্তী বড় একটা পাওয়ার হাউসে কাজ করতেন ওদের বাবা। পেড্রোর থেকে ফিলো বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট ছিল। স্কুলে মাত্র ন'বছর পড়লেও ইংরেজীটা বেশ ভালই রপ্ত করেছিল। তার কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফিলো ইউ এস এসের মার্চেন্ট নেভীতে কাজ

করেছিল। ১৯৫০ সালের শুরুতে পেড্রোকে দেখতে গ্রীনফিল্ডেও এসেছিল। তবে বেশী দিন থাকে নি। চরিত্রের দিক থেকে ফিলো ছিল কিছুটা অস্থির প্রকৃতির। স্প্যানিস এবং ইংরেজী দু'ভাষাতেই কথাবার্তা চালাতে পারতো। এখানে বলা প্রয়োজন, কারলস্ এলেণ্ডেও স্প্যানিস এবং ইংরেজীতেও দক্ষ ছিল। ফিলো নিজেই বই পড়ে যা শিখেছিল তা'ছাড়াও অপর্যাপ্ত পড়াশোনা করতো। সন্দেহাতীত ভাবে এলেণ্ডের সঙ্গে ফিলোর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু'জনেই সেই সময়ের। মিসেস ব্লকসনের মতে ফিলো কথাবার্তা সাধারণত বেশী বলতো না। তবে অ-দরকারী কোন বিষয়ে কথা আরম্ভ করলে তা' আর শেষ করতে চাইতো না। নিঃসঙ্গ প্রকৃতির পুরুষ। কাউকে কিছু না বলেই মাঝে মাঝে হাওয়া হয়ে যেতো। দিনের পর দিন, মাস এবং বছর ঘুরে গেলে হয়তো বা ফিরে আসতো। তবে কোথায় গিয়েছিল বা কেন গিয়েছিল—এসব ব্যাপারে মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে থাকতো। মানবত্ব এবং ঈশ্বর সম্পর্কে ওর চিন্তা ছিল নেতিবাচক। আর প্রায়ই নিজের নাম বদলাতো।

যাইহোক, ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফিলো প্রায়ই পেড্রোর বাড়ীতে বেড়াতে আসতো: কিন্তু এই সময়েই একপারিবারিক দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। পেড্রো মই-য়ে চড়ে বাড়ীর একটা অংশ সারাই করতে করতে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়। বাইরের থেকে আঘাতটাকে বড় না মনে হলেও ভেতরে ভেতরে রক্তপাত হতে থাকে। কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে পেড্রো। সংসারটা এমনিতেই দারিদ্র্যের সুতোয় ঝুলছিল, এবার যেন ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হয়। ফিলোর সাহায্য হয়তো বা এই সময়ে পরিবারের পক্ষে প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল। কারণ প্রতি পায়ে পায়ে পরিবারটাকে তখন অভাবের পেরেক খোঁচা দিয়ে চলেছে। তবে ব্যাপারটা সবচেয়ে খারাপ হয়ে দাঁড়ায়, যখন ফিলো পেড্রোর সংসারের এই দুরবস্থার কথা না জেনে ঘর ছেড়ে দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ে। পেড্রোর আর রোজগার বলতে তখন কিছু নেই, ঘাড়ের উপর এতোবড় সংসার ; সুতরাং ডাক্তারের খরচা আবার কে জোগাবে। একেই তো

পেড্রোর রোজগার পাতি বলতে সব বন্ধ ; তদুপরি সংসারের খরচ—অবস্থাটা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯৫৫ সালের ১৯শে মে রাত দু'টো পনেরো মিনিট নাগাদ এলিগ হেনি কাউন্ট পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার আর ডবলু কুক পেড্রোর একজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা টেলিফোন পায় যে পেড্রো একটা বড় হাতুড়ী নিয়ে ওর বৌ-কে তাড়া করে ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়। কিন্তু এসে পৌঁছাবার আগেই দেখে হতভাগ্য পেড্রো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে নিজের বাড়ীতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

এলেণ্ডে পরিবার তখন সর্বস্বান্ত। মিসেস এলেণ্ডেকে সিভিক্‌লে ভ্যালি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অকস্মাৎ মহিলার তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। চার ছেলেপেলের সবচেয়ে ছোটটার বয়স তখন মাত্র দু'বছর ; প্রতিবেশী এবং বন্ধুরা ভাগাভাগি করে ওদের দেখা-শোনার ভার নেয়। পেড্রোকে উড্‌ভিলে পেনসিলভেনিয়ার সরকারী উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন পরে পেড্রো সেই উন্মাদ আশ্রমেই মারা যায়। বাথটবের মধ্যে পড়ে গিয়ে।

ইতিমধ্যে মিসেস এলেণ্ডে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের কাছ থেকে ছেলেপেলেদের নিজের কাছে এনে আরেকটা শহরে মোটামুটি ভালো একটা অ্যাপার্টমেন্ট দেখে উঠে যায়।

ব্যাপারটার কিন্তু এখানেই যবনিকাপাত হয় না। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি সম্পন্ন হওয়ার কয়েকদিন পরেই ফিলো এসে হাজির হয়। তখন ১৯৫৫ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি। প্রায় একবছর গর হাজির থাকার পর। ওর কোন ধারণাই ছিল না ইতিমধ্যে বাড়ীতে কি ঘটে গেছে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দু'চার টুকরো কথা শুনে ছুটে যায় সিভিক্‌লেতে মিসেস ক্লকসনের কাছে। মিসেস ক্লকসনের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারে ফিলো। দুঃখজনক ঘটনায় ভেঙে পড়ে দু'একদিন সেখানে কাটিয়ে আবার অদৃশ্য হয়। ওর পরিবার আর বন্ধুরা আর কখনো ওর কথা শুনতে পায়নি। এর কিছুদিন পরেই ডক্টর জেসুপ কারলস্ মিগুয়েল এলেণ্ডে বলে এক-

জনের কাছ থেকে গোটা তিনেক চিঠি পায়।

তবে এবারে আরেকটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কারলস্ আর ফিলো এলেণ্ডে কি একই ব্যক্তি? কারলস্‌কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে কোন উত্তর না দিয়ে সে চুপচাপ থাকে। মিসেস ব্রুকসন ফিলোকে যিনি বেশ ভালো করেই কাছ থেকে দেখেছেন, ছবি দেখানো হলে তিনিও নির্দিষ্ট কোন উত্তর দিতে পারেন না। একজন গবেষক তো শেষমেষ এই ধারণাতে এসেছে যে ফিলো এলেণ্ডে তার সত্যিকারের বন্ধু। কার্ল অ্যালেন কোন দুর্ঘটনায় হঠাৎ মারা গেলে ওর পরিচয়পত্রটা কোনরকমে হস্তগত করে। আর মাঝে-মধ্যে কার্ল অ্যালেন বলে নিজেকে পরিচয় দিতে শুরু করে। কারণটা অবশ্য সবচেয়ে ভালো বলতে পারে কারলস্ স্বয়ং।

এতসব হলো এলেণ্ডেকে খুঁজে বার করার ব্যাপার-স্যাপার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশেষ একজনের কাছ থেকে ব্যাপারটায় কতোখানি আলোকপাত হ'তে পারে। তা'তে কি ফিলাডেলফিয়া একসপেরি-মেণ্টের মতো শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যের কিছু সমাধান হওয়া সম্ভব? তবে যাই হোক না কেন সমস্যাটার সমাধানকল্পে এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা কম নেই।

সত্যটুকু ছেঁকে নিলে বলা যায় এলেণ্ডে বৈজ্ঞানিক নয়। এমন কি পর্যবেক্ষণের কোন শিক্ষাও তার ছিল না। নেহাৎ ঘটনাক্রমে ডেকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ-ই ঠিক সময়ে একস্‌পেরিমেণ্টটা দেখে ফেলেছিল। একস্‌পেরিমেণ্টটাকে বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করার মতো জ্ঞান যে ওর ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যিই কি ও দেখেছিল যে চোখের সামনে একটা জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে? ওর মত,—হ্যাঁ। কিন্তু তাহলে কিভাবে সেটা করা হয়েছিল? ও তা' পরিপূর্ণরূপে জানে না। তবে শক্তিক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত। চারদিকে প্রচুর পরিমাণে স্থির বিদ্যুৎ বর্তমান ছিল। জাহাজটার নাম কি ওর জানা ছিল? উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ। ডি ই ১৭৩। এবার তাহলে প্রশ্ন আসে, একবারের বেশী কি ও জাহাজটাকে অদৃশ্য হ'তে দেখেছে? উত্তর,—না। কিন্তু একস্-

পেরিমেণ্টটা নাকি একবারের বেশী-ই করা হয়েছিল। আইনষ্টাইন, রাসেল, এডমিরাল বেনেট্—এদের খবর পেলো কোথেকে এলেণ্ডে? উত্তর, ওর উচ্চপদস্থ সামরিক বিভাগের বন্ধুদের কাছ থেকে। যারা কিছুতেই তাদের নাম প্রকাশ করতে চায় নি। ডক্টর আইনষ্টাইন নাকি স্বয়ং এক্স্পেরিণ্টের তদারকি করেছিলেন। আর এলেণ্ডে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছিল লোডিং ডকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মানুষকে অদৃশ্য হয়ে যেতে। তবে সঠিক তারিখ আর কোন ডক থেকে লোকটা অদৃশ্য হয়, তা ঠিক স্মরণে আনতে পারে না। এলেণ্ডের নিজের ভাষায় একস্‌পেরিমেণ্টটার বর্ণনা নিম্নরূপ:

আপনারা তাহলে সত্যি সত্যি আইনষ্টাইনের সেই বিরাট একস্‌পেরিমেণ্টটার কথা জানতে চান? শক্তিক্ষেত্রটা যখন প্রবাহিত হয়, আমার প্রসারিত হাতটায় প্রচণ্ডরকমের ধাক্কা খাই। হ্যাঁ, নেভীর ছোট্ট জাহাজ ডি ই ১৭৩ এর দিক থেকে আসা কাউণ্টার ক্লকওয়াইজ্ ধাক্কাটাকে আমি অনুভব করতে পারি। হাতটা যেন সজোরে শক্ত নিরেট একটা বস্তুতে আঘাত পায়।

জাহাজটার চারদিকের হাওয়া আমি পর্যবেক্ষণ করি। ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে বাতাসটা। চারদিকের বাতাসের চেয়ে জাহাজের চারপাশের বাতাসটা কালো রঙের, কয়েক মিনিট পরে সবজে রঙের কুয়াশায় পাত্‌লা মেঘের মতো চতুর্দিক ঢেকে দেয়। নিশ্চয়ই কুয়াশাটা কোনরকম পরমাণুর দ্বারা সৃষ্ট। চোখের সামনে থেকে ডি ই ১৭৩ জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে সাগরের বুকে যেন জাহাজটার অস্তিত্বের ছাপ চোখে ধরা পড়ে। আমাদের জাহাজ তখন ডি ই ১৭৩'রের পাশাপাশি চলেছে। অবশ্য যদিও আমি আজ ঘটনাটা বলছি, সেদিন কিন্তু এসব এতো মনযোগ দিয়ে দেখি নি।

ডি ই ১৭৩ জাহাজটাকে ঘিরে থাকা শক্তিক্ষেত্র একটা গুনগুন আওয়াজ তোলে; মৃদু ভাবে শুরু হলেও খুব সত্বর শব্দটা একটানা হয়ে চলে। কয়েক মুহূর্ত পরেই শব্দটা এতো প্রচণ্ড জোরে হয় যে মনে হয় একটা বিরাট ঝড় তেড়ে ফুঁড়ে আসছে। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু উথাল-পাথাল করে দেওয়ার জন্য।

শক্তিক্ষেত্রটার চারপাশে তড়িৎ প্রবাহ বয়ে চলছিল। সেই প্রবাহ এতো শক্তিশালী যে হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে ক্ষেত্রটার বাইরে ফেলে দেয়। এবং আমি জাহাজের ডেকের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে যাই তবে সারা শরীর আমার শক্তিক্ষেত্রের মধ্যে না পড়ায় শুধু হাত এবং বাহুমূলই শক্তি প্রবাহের দরুণ পেছন দিকে ঠেলতে থাকে

আমার সমস্ত শরীর যে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে যায় নি তার কারণ সম্ভবত আমার পায়ে নাবিকদের উঁচু রবারের জুতো আর গায় কোট থাকার দরুণ। নেভেল ও এন আর বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে আজ আর কিছু জানার উপায় নেই। কি করে সেদিন বিজ্ঞানের পথটা পেছনদিকে ঘুরেছিল। পরে আমি অনেক চিন্তাভাবনার পরে বিশ্বাস করি যে ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম।

ডক্টর জেসুপকে চিঠি দিয়ে বিপথে চালানোর চেষ্টার কারণ হিসেবে এলেণ্ডের বক্তব্য হলো, জেসুপ যদি ইউনিফাইড ফিলড থিয়োরী নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে সরকারকে রাজী করিয়ে ফেলে, তবে এলেণ্ডের ভয় তার ফলাফল সমস্ত সমাজের পক্ষেই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াবে। হয়তো সমাজের অস্তিত্বই মুছে যাবে।

তবে গত দু'দশক ধরে যে রহস্য তোলপাড় করছে, তার সমাধানের জন্য যেসব খবরের দরকার তা' এলেণ্ডের কাছে নেই। যদিও এলেণ্ডে দাবী করে যে ওর কাছে তা' রয়েছে। তবু ওর বলা সব খবরগুলোর স্বপক্ষেও এলেণ্ডে কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারে নি।

১৯৫৯ সালে কলরাডো স্প্রিং পার্কে বিমান বাহিনীর ডেভিস আর হিউজকে হয়তো বা এই এলেণ্ডেই ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের কথা প্রথম বলেছিল। ওরা দু'জনেই যদিও বলেছিল লোকটাকে দেখলেই চিনতে পারবে, কিন্তু এলেণ্ডের ছবি দেখানোয় কেউ-ই ওকে চিনতে পারে নি। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, এই-ই যদি এলেণ্ডে হয়, তবে কে সেই ব্যক্তি যার দ্বারা এই রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে!

## ॥ ছয় ॥

এলেঙের চিঠিগুলো সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি-ই এই একসপেরিমেণ্টের সঙ্গে জড়িত ছিল। ডক্টর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, ডক্টর বি রাসেল, ডক্টর ফ্রাংকলিন রেনো, চীফ মেট মাউস্‌লে, রিচার্ড স্প্রীস্‌লে প্রাইস্‌, কণালী, রেয়ার এড্‌মিরাল রাউসন বেনেট্‌, বার্কে ইত্যাদি। প্রথম দু'জনের নাম সকলেই জানে। ডক্টর বি রাসেল আর কেউ নয়; স্বয়ং বার্ট্রাণ্ড রাসেল। প্রখ্যাত লেখক, দার্শনিক, মানবতাবাদী এবং শান্তিবাদী। জীবনের শেষ পর্বে রাসেলের সঙ্গে আইনষ্টাইনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। নিভৃতে উভয়ে বহু বিষয়েই আলোচনা করতো। মনে হয় সেই সময়েই হয়তো বা আইনষ্টাইন তার ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী এবং তার বিপজ্জনক ব্যবহারের কথা রাসেলকে বলে থাকবে। তখনই হয়তো বা রাসেল থিয়োরীটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করার জন্য বন্ধুবর আইনষ্টাইনকে অনুরোধ জানান।

তালিকার তৃতীয় ব্যক্তি ডক্টর ফ্রাংকলিন রেনোকে খুঁজে বার করা সত্যি কষ্টকর। কারণ নামটা ছদ্মনাম। অবশ্য তাতে রহস্যের ভিয়ানে এতোটুকু ঘাটতি হওয়ার কথা নয়। তালিকায় তারপরের তিনজনের নাম নাবিক হলেও তাদের অনেক খোঁজ করেও পাওয়া যায় না। আর্থার মাউডস্‌লে বলে একজন ছিল। ফুরুৎসেথের চীফ মেট। অবশ্য তার কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজখবর করেও বিশেষ সুবিধে হয় নি। কারণ নেভীর তরফ থেকে তার তৎকালীন কার্যকলাপ সম্পর্কে বিলকুল মুখে কুলুপ এঁটেছে।

ভার্জিনিয়ার রোনেকার থেকে কম খবর জোগাড় করা সম্ভব হয়। রিচার্ড অবশ্য ১৯৭৩ সালে মারা যায়। আর কণালীর প্রথম নাম সম্ভবত ফ্রাংক অথবা পিটার। নিউ ইংল্যাণ্ডে কণালী উপাধি সম্পন্ন শ'য়ে শ'য়ে লোক বর্তমান।

ফুরুৎসেথ্‌ জাহাজের সারেঙ তালিকা যেহেতু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, সেইজন্য এলেঙের সঙ্গে আর কারা নাবিক ছিল খুঁজে

পাওয়া আজ আর সম্ভব নয়। তবে অনেক খুঁজে পেতে তিনজন সারেঙের নাম পাওয়া গেছে। হারম্যান সি স্থলট্জ, উইলিয়াম রাইলি অথবা রিপ্লে এবং লুইস ভিন্‌সেন্ট। এরা সবাই এসেছিল নিউ ইয়র্ক এবং নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চল থেকে রাইলি সম্ভবত পেশাদারী গায়ক ছিল, ভিনসেন্ট নিউ ইংল্যাণ্ডের ছেলে আর স্থলটজের মার্চেন্ট নেভীতে ছিল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা।

এলেণ্ডে ওর দ্বিতীয় চিঠিতে যার নাম করেছে, সেই এডমিরাল রাউসন দ্বিতীয় বেনেট সত্যি ওর দ্বিতীয় চিঠিটা লেখার সময় অর্থাৎ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ সালে এডমিরাল ফ্রেডরিক আর ফ্র্যুথের কাছ থেকে ভার বুঝে নেয়। ঘটনাটা ঘটেছিল কিন্তু মাত্র ক'দিন আগে। এই খবরটা এতো সত্বর কি করে এলেণ্ডের কানে পৌঁছলো সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়কর। আর চিঠিটা এলেণ্ডে ডাকঘরে ফেলেছিল গাইনেস্‌ভেলে, টেক্‌সাস থেকে। তালিকার সব শেষের নাম হলো বার্কের। ফিলাডেলফিয়া একসপেরিমেন্টের সময় নাকি চীফ অফ নেভেল রিসার্চের অধিকর্তা ছিল এই বার্ক।

এটা সঠিক নয়। তখন অবশ্য এডমিরাল অরলিগ এ বার্ক নামে একজন ছিল। তবে নেভেল রিসার্চের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না। আসলে এই বার্ক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একটা ডেসট্রয়ার স্কোয়াড্রেনের নেতৃত্ব করেছে ১৯৪৩ সালে প্যাসিফিক মহাসাগরে। সেই সময়েই অবশ্য যদিও ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্টটা সংঘটিত হয়েছিল তবু বার্ক সারাটা জীবনে ক্লাস অফিসারের থেকে উঁচু পদে উঠতে পারে নি।

যাইহোক, এলেণ্ডের ভুলটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে মানুষে দ্বারা এই রকম ভুল হওয়া সম্ভব নয়। ডক্টর জেস্থপের কাছে লিখিত তৃতীয় চিঠিটাতে বার্কের যে বর্ণনা ও দিয়েছে, তাতে দেখা যায় সেই ব্যক্তির কৌতুহল ও কর্মক্ষমতা অতুলনীয়। নতুন গবেষণার দিকেও তার যথেষ্ট ঝোঁক বর্তমান। এই গুণগুলো অবশ্য এডমিরাল বার্কের চেয়ে এডমিরাল হেরল্ড জি বোভেনের চরিত্রের সঙ্গেই অনেক বেশী খাপ খায়। এডমিরাল বোভেন নেভেল রিসার্চ ল্যাবরেটারীর

ডাইরেকটর হিসেবে কাজ করতেন। যখন ফিলাডেলফিয়া এক্স্‌-পেরিমেন্ট কাগজে কলমের ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক গোপন প্রজেক্ট নিয়েই এডমিরাল বোভেন নাড়াচাড়া করেছেন। হয়তো বা এলেণ্ডে নামের উল্লেখ করতে গিয়ে দু'জনের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে। তবে এমন হওয়া কি অসম্ভব যে ইচ্ছে করেই এলেণ্ডে এই ব্যাপারটা করেছে। কারণ এডমিরাল বেনেট্‌কে তো ঠিক মতোই এলেণ্ডে চিহ্নিত করেছে।

ডক্টর জেসুপের পরিণতি, বর্তমানে বর্ডারল্যাণ্ড সাইনস্‌ রিসার্চ ফাউণ্ডেসন অফ ভিস্তা, কালিফোর্নিয়ার ডক্টর রাইলি এইচ ক্র্যাচ ফিলাডেলফিয়া এক্স্‌পেরিমেন্টের রহস্যটার ওপরে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছিল। ওর লেখা বইটার নাম ছিল এম কে জেসুপ'স্থ এলেণ্ডে লেটারস এণ্ড গ্রেভেটি। ক্র্যাচের মতে বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং অ্যান্টি গ্রেভেটি সম্পর্কে গবেষক টি টাউনসেণ্ড ব্রাউন যখন চীফ ব্যুরো অফ্‌ শিপস্‌ ছিল, তখনই জিনিসটা ব্রাউনের মাথা থেকে বেরোয়। কিন্তু পরে দেখা যায় যদিও ব্রাউন নিঃসন্দেহে এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তবে আইডিয়াটা ওর নয়।

ক্র্যাচের পথ ধরে এগোলে আমরা পাই গ্যারি বার্কারকে। ক্লার্কসবুর্গ, ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া থেকে স্থানীয় একটা সংবাদপত্র প্রকাশ করা ছাড়াও ফ্লাইং সসার সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেছে এই বার্কার। তবে রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে বার্কারের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। শুধু ওর বই থেকে জানা যায় ডক্টর জেসুপের অনুরোধে ওর মৃত্যুর পর ওর মৃত দেহটাকে বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করা হয়। এবং ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬২ সালে তা সমাধিস্থ করে। তবে বার্কারের বইতে ছাপা এক কর্ণেল বি'র লেখা একটা চিঠি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। চিঠিটার কয়েকটা অংশ হলো:

এটা সত্যি অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে যদি ডক্টর জেসুপের আত্মহত্যাকে ঘিরে রহস্যের জট পাকানো হয়।

১৯৫৮ সালে জেসুপের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, মনে

হয়েছিল পদার্থবিদ্যার একটা জটিল রহস্য খোলার আশায় ওর মন তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের সাক্ষাতের সময় জেস্তুপ বলেছিল যে সামরিক বাহিনী ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীকে ঘিরে গোপন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল, সেই সম্পর্কে কয়েকটা চিঠি ইতিমধ্যে পেয়েছে।

আমি মনে করি জেস্তুপ এই ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। অবশ্য উফোর সম্পর্কে সরকার পক্ষের উৎসাহের কমতি নেই। তবে গোপন সামরিক এক্সপেরিমেন্টের যে কথা জেস্তুপ অনবরত বলেছে, মনে হয় ব্যাপোরটা পুরোপুরি কোন ধাপ্পাবাজের কাজ। হয়তো বা সত্যিকারের কোন সামরিক একসপেরিমেন্টকেই রহস্যের পোশাক পরিয়ে কেউ হাজির করিয়ে দিয়েছে জেস্তুপের কাছে।

যাই হোক না কেন ১৯৭৩ সালে এই বার্কারই মার্জিনের মন্তব্য সহ সেই বই 'দ্য কেস ফর দ্য উফো' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। অবশ্য খুবই অল্পসংখ্যায়। তবু যে জিনিসটার অস্তিত্ব শুধু গুজবে ছিল, এতো দিন পরে তা দিনের আলোতে আত্মপ্রকাশ করে।

তবে কি বারমুডা ট্রাঙ্গলে যে বছরের পর বছর ধরে জাহাজ প্লেন অদৃশ্য হয়ে চলেছে, ফিলাডেলফিয়া একসপেরিমেন্টের রহস্যোদ্ধার করতে পারলে সেই রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে!

এই ব্যাপারে ডক্টর জেস্তুপ যে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই! বন্ধুদের নাকি জেস্তুপ বলেছিল, একজন নাকি সোজা নেভী কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বলে তোমাদের কামাফ্লেজের দরকার? আমাকে একটা জাহাজ দাও, আমি তোমাদের নিখুঁত কামাফ্লেজ দেখিয়ে দিচ্ছি। লোকটা যখন যে জাহাজের ওপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে, তাতে চড়ে—তখন তার কাছে কালো রঙের একটা চামড়ার বাক্সো ছিল।

গ্যারি বার্কার একবার বলেছিল, ডক্টর জেস্তুপের এক বন্ধুর কাছে কয়েকটা অত্যন্ত গোপনীয় নথিপত্র রয়েছে। সেগুলো খুঁজে বার করতে পারলে নাকি সমস্যার সমাধান সম্ভব। সেই বন্ধু নাকি এলেণ্ডেকে প্রচুর খুঁজছে, কিন্তু পায়নি।

১৯৬৭ সালে ব্রাড ষ্টাইগার নামে একজন লেখক এই সম্পর্কে একটা বই লিখলে তার প্রকাশক এলেণ্ডের কাছ থেকে আবার কয়েকটা চিঠি পায়। রীতিমতো শাসিয়ে লেখা চিঠিগুলো। এলেণ্ডের ভয় হয়তো বা নেভী আবার এই সূত্র ধরে ব্যাপারটার পেছনে লেগে যাবে। প্রকাশক বইটার সঙ্গে এলেণ্ডের চিঠিগুলোও ছেপে দেয়; বইটার নামকরণ করা হয়, দ্য এলেণ্ডে লেটারস, নিউ উফো ব্রেক থ্রু; ১৯৫৯ সালে বইটা প্রকাশিত হয়।

এলেণ্ডে এবার পুরোপুরি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওরই দেওয়া তথ্যের ওপরে বই লিখে প্রচারের জোরে অনেকেই প্রচুর টাকা পয়সা কামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ওর অবস্থা কপর্দকশূন্যতায় এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং প্রতিহিংসার বশে ঠিক করে যে সমস্ত ব্যাপারটাকেই ও ধাপ্পা বলে স্বীকার করে নেবে। তাহলে শুধু যে এই লোকগুলো অসুবিধায় পড়বে তাই নয়, ওদের লেখা বইগুলোর বিক্রীও বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিকল্পনা মতো ১৯৫৯ সালের জুন মাসে কারলস্ মিগুয়েল এলেণ্ডে সোজা এরিয়াল ফেনোমেনা রিসার্চ অরগানাইজেসনে এসে হাজির হয়। এই এ পি আর ও হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং বিখ্যাত উফো গবেষণা সংস্থা। টাক্সন আরিয়াজে অবস্থিত। সখানে হাজির হয়ে নিজে মুখে বলে যে পুরো ব্যাপারটাই ওর দেওয়া বিরাট একটা ধাপ্পা; অদৃশ্য জাহাজ কিংবা শক্তিক্ষেত্র সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই।

কিন্তু লোরেনজেন যখন গোপনে একটা মোটর গাড়ীর ভেতরে প্রায় এক ঘণ্টার ওপরে এলেণ্ডের সঙ্গে কথা বলে, তখন এলেণ্ডে বলে যে একটা আমেরিকান জাহাজে ফিলাডেলফিয়া ইয়ার্ড থেকে অদৃশ্য হয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নরফোল্ক পোর্টস মাউথ অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয়, আবার সেটা মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসে ফিলাডেলফিয়া ডকে। যেখান থেকে জাহাজটা অদৃশ্য হয়েছিল। এলেণ্ডে আরো বলে যে ঘটনাটাকে যাচাই করা যেতে পারে যেসব নাবিক তখন সেই

জাহাজে ছিল তাদের কাছ থেকে। ওদের অনেককে ব্যক্তিগত ভাবে এলেণ্ডে চেনে।

ঘটনাটা সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের একটা বীজ উপ্ত করে দিয়ে এলেণ্ডে আবার লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

ডক্‌টর জে ম্যানসন ভালেন্‌টাইন ব্যাপারটাকে আবার আলোতে নিয়ে আসে। ডক্‌টর ভ্যালেন্‌টাইন ব্যক্তিগত জীবনে ছিল ওসেনোগ্রাফার। জুলজিস্ট এবং আর্কিওলজিস্ট; দীর্ঘদিন বারমুডা ট্রাঙ্গল রহস্যের ব্যাপারেও জড়িত ছিল। ফ্লোরিডায় ডক্টর জেস্নুপের সঙ্গে ডক্‌টর ভালেনটাইনের বন্ধুত্ব হয়।

ডক্টর ভালেন্‌টাইন জানায়, ফ্লোরিডায় থাকার সময় জেস্নুপ প্রচণ্ডরকমের হতাশায় ভুগছিল। এবং মৃত্যুর মাসখানেক আগে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট নিয়ে ডক্টর ভলেন্‌টাইনের সঙ্গে অনেক আলোচনাও হয়েছিল। সম্ভবত ভালেন্‌টাইনই হলো সর্বশেষ ব্যক্তি যার সঙ্গে ডক্টর জেস্নুপ এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিল। ভ্যালেন্‌টাইনের মনে আছে দিনটা ছিল ২০শে এপ্রিল, ১৯৫৯ সাল। কথাবার্তা, আলাপ আলোচনার পর সেই সন্ধ্যায় ভালেন্‌টাইন ডক্টর জেস্নুপকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে। সেই নিমন্ত্রণ ডক্টর জেস্নুপ গ্রহণ করলেও ডিনারে কিন্তু আসে নি। —কেন? তাহলে কি ডক্টর জেস্নুপ আত্মঘাতী হয়েছিল? ভালেন্‌টাইনের উত্তর কিন্তু এই ব্যাপারে বিস্ময়কর। যদি জেস্নুপ আত্মহত্যা করেও থাকে, তবে তা' চরম হতাশার ফল। নেভী ওকে অনুরোধ করেছিল ফিলাডেলফিয়া এসস্‌পেরিমেন্ট বা এই ধরনের প্রজেক্টের ওপরে আরো গবেষণা চালিয়ে যেতে। কিন্তু ডক্টর জেস্নুপ রাজী হয় নি। কারণ এই গবেষণার মারাত্মক ফলাফল সম্পর্কে জেস্নুপ রীতিমতো উদ্বিগ্ন ছিল। ভালেন্‌টাইনের ধারণা, হয়তো বা ওকে বাঁচানো যেতো; কারণ ওকে যখন পাওয়া যায় তখনো জেস্নুপ বেঁচে ছিল। হয়তো বা ইচ্ছে করেই ওকে মরতে দেওয়া হয়েছে।

ভালেন্‌টাইন আরও জানায় যে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট সম্পর্কে জেস্নুপের জ্ঞান ছিল বিস্তারিত। আর জেস্নুপ তো ভুতুড়ে

লেখক ছিল না, বিখ্যাত বিজ্ঞানী। জেস্নুপ ভালেন্টাইনকে জাহাজ অদৃশ্য করার প্রজেক্টটা সম্পর্কে বলেছিল যে, এই একস্‌পেরিমেণ্টের জন্য নেভেল টাইপ ম্যাগ্‌নেটিক জেনারেটার ব্যবহার করা হয়েছিল। যার নাম হলো ডিগার্ডসার্স। এই যন্ত্রের কাজ হলো অনুনাদ ফ্রিকোয়েন্সী তৈরী করা। যার সাহায্যে স্থির কোন জাহাজের ওপরে এবং তার চারপাশে প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন এক শক্তিক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব।

ডক্টর ভালেন্টাইনের মতে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেণ্ট যে সত্যাই সংঘটিত হয়েছিল সেই সম্পর্কে জেস্নুপের মনে কোনরকম দ্বিধা ছিল না। এই বিষয়ে জেস্নুপ নেভী অফিসার এবং প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের সাথেও বিস্তারিত আলোচনাও করেছে। জেস্নুপ ওকে বলেছিল একস্‌পেরিমেণ্টটা যে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক তা'তে সন্দেহ নেই। তবে ভীষণরকমের বিপজ্জনক। বিশেষ করে যারা এই প্রজেক্টের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। চৌম্বক অনুনাদ যে বস্তুর প্রতি প্রক্ষিপ্ত করা হয়, সেই বস্তু সাময়িক ভাবে আমাদের পরিচিত ডাইমেনসান থেকে এক অপরিচিত ডাইমেনসানে চলে যায়। তবে এই ধরনের যাত্রার সব সময়েই আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার ঝোঁক থাকে। যদি আয়ত্বের মধ্যে রাখা যেতো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা হয়তো বা পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমিই বদলে দেওয়া যেতো।

এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, এই ধরনের একস্‌পেরিমেণ্টের ফলাফলের সঙ্গে এলেণ্ডের চিঠির সাথে জেস্নুপের মতামতের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

এলেণ্ডেও লিখেছিল যে, একস্‌পেরিমেণ্টের পরে সেই জাহাজের কয়েকজন নাবিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, কয়েকজন মারা যায়, আর বাকীরা পাগল হয়ে যায়। একস্‌পেরিমেণ্টটা যখন সুরু হয়, সব্‌জে কুয়াসায় তখন চারদিক ঢেকে ফেলে। বারমুডা ট্রাঙ্গলের কবল থেকে যারা ফিরে এসেছে, তারাও কিন্তু এই রকমের সব্‌জে কুয়াসার কথা বলেছে। ধীরে ধীরে সেই কুয়াসা জাহাজটাকে ঢেকে দেয়। ডেকের ওপরের মানুষগুলো ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হ'তে

সুরু করে। তখন শুধু নজরে আসে একটা রেখার ছাপ। ডক্টর জেসুপ নাকি মৃত্যুর আগে জেনে ফেলেছিল যে ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে কী; এবং সেই আলোকেই আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর ব্যাখ্যা দেওয়া নাকি সম্ভব।

বাস্তবক্ষেত্রেও এই থিয়োরীর প্রয়োগের ব্যাপারটা হলো, ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে সমকোণ করে একটা কয়েলের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষেত্র প্রথমে তৈরী করে নিতে হবে; এইরকম ভাবে তৈরী প্রতিটি ক্ষেত্র এক একটা স্পেসের সমতলের প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং ওর-ই মধ্যে থার্ড ফিল্ড বা তৃতীয় ক্ষেত্রের অবস্থান নিশ্চয়ই থাকবে। সেটাই সম্ভবত মাধ্যাকর্ষণ।

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক জেনেরেটারের সাহায্যে এইবার চৌম্বক তরঙ্গ তুলতে হবে। হয়তো বা অনুনাদের দ্বারাও তৃতীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। জেসুপ ভালেনটাইনকে বলে যে ইউ এস নেভী এই পথ ধরেই এগিয়েছিল।

যাইহোক, ব্যাপারটা নিয়ে সোরগোল পড়ে গেলে সরকারের তরফ থেকে ঘটনাটার ওপরে কিছু ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেবার জন্য উফোর ম্যাগাজিনে ওদের বক্তব্য রাখে। তবে সেগুলো সবই মিথ্যাকথার চূড়ান্ত নিদর্শন। ভালেনটাইনের বক্তব্য ধরে এগিয়ে গেলে নীচের ধারণায় পৌঁছানো যায়।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি জেসুপ ভালেনটাইনকে বলে যে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্টের ফলশ্রুতি হিসেবে, বেশ কতোগুলো ঘটনা পরখ করার পর জেসুপ নির্দিষ্ট একটা ধারণায় এসে পৌঁছেছে। এবং কাগজপত্রও সেইভাবে তৈরী করেছে। এখন ভালেনটাইনের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চায়। ডক্টর ভালেনটাইন জেসুপকে ২০শে এপ্রিল ডিনারে আমন্ত্রণ জানায়।

কিন্তু আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও সেদিন জেসুপ ডিনারে আসে নি। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার আগে জেসুপ গাড়ী নিয়ে যায় ম্যাথেসন্ হামমকে; ম্যাথেসন হামমক একটা কানট্রি পার্ক। এবং সেখানেই গাড়ীর মধ্যে আত্মহত্যা করে। রিপোর্টে

পুলিশ আরো বলে যে কোনরকম পাণ্ডুলিপি বা চিঠিপত্র জেস্থপের গাড়ীতে পাওয়া যায় নি।

পুরো ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করলে কয়েকটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। একস্পেরিমেণ্টের হয়তো বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল; চেষ্টা করতেও হয়তো বা কসুর করে নি। কারণ কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে নেভী সেইসময় একটা আগুন নেভানোর জন্য দু' মিলিয়ন ডলার খরচা করেছে।

কিন্তু তাহলে কি একস্পেরিমেণ্টটা আংশিক সফল হয়েছিল? নাকি বিলকুল ব্যর্থ। এই একস্পেরিমেণ্টের সঙ্গে জড়িত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে হয়তো বা নির্দিষ্ট একটা উত্তরে পৌছানো সম্ভব হ'তে পারে।

## ।। সাত ।।

কারলস মিগুয়েল এলেণ্ডে আর ভালেনটাইনের কথা অনুসারে ফিলাডেলফিয়া প্রজেক্টের ভিত্তিভূমি ছিল জটিল এক বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব —ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী। বা সংক্ষেপে ইউ এফ টি। ডক্টর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন প্রথম এই থিয়োরীর উদ্ভাবক। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ডক্টর আইনষ্টাইন নাকি এই থিয়োরী আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এই থিয়োরীর প্রয়োগ মানবজাতির বিধ্বংসী সর্বনাশ ডেকে আনবে বলেই এর বাস্তব প্রয়োগের দিকটা নিয়ে আইনষ্টাইন আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান নি। এলেণ্ডের চিঠি অনুসারে ডক্টর আইনষ্টাইন নাকি এই থিয়োরী নিয়ে বন্ধুবর বার্ট্রেণ্ড রাসেলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাও করেছিলেন। রাসেলও সম্ভবত এই ব্যাপারে আইনষ্টাইনকে নিরুৎসাহ করে থাকবেন। কারণ শান্তিবাদী হিসেবে রাসেলের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী।

এলেণ্ডে কিন্তু তার খবরের উৎস বলে নি। তাই এলেণ্ডে কোথা থেকে খবরটা জোগাড় করেছিল, তা খুঁজে বার করা মোটেই সহজসাধ্য কাজ নয়। যদিও এর সঙ্গে পৃথিবী বিখ্যাত মনীষীরা

জড়িত। তবে খোঁজ করতে গিয়ে আশ্চর্যজনক খবরাখবর পাওয়া যায়।

ডক্টর আইনষ্টাইন সত্যই মাধ্যাকর্ষণ এবং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী ১৯২৫—১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ করেছিলেন। ১৯২৫ এবং ১৯২৭ সালে জার্মানীর প্রুশিয়ার একটা বিজ্ঞানপত্রে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। তবে এলেণ্ডে ঠিকই বলেছে, এর বিষময় ফলাফলের কথা চিন্তা করে আইনষ্টাইন থিয়োরীটাকে নিয়ে বেশী দূর আর এগোননি। এমন কি এর বাস্তব প্রয়োগের দিকটাও ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আরো রহস্যময় যে আইনষ্টাইন নিজেও ১৯৪০ সালের আগে এই থিয়োরী সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। কিন্তু শান্তিবাদী হলেও আইনষ্টাইন নাৎসীবাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই যে কোন উপায়ে তার ধ্বংসের প্রয়োজন ভেবে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর আত্মপ্রকাশ ঘটান। আইনষ্টাইনের চিন্তায়, তখন যে কোন উপায়ে নাৎসীবাদকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়া উচিত। ১৯৪০ সালেই যে ইউ এস এ নেভী ফিলাডেলফিয়া প্রজেক্টের কাজ প্রথম শুরু করে, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

আইনষ্টাইনের সঙ্গে রাসেলের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের কথা সবাই জানে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে। প্রায়ই দু'জন এক সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতো। উভয়েই একটা বিষয়ে একমত ছিল যে বিজ্ঞানের উন্নতি একদিন মানব জীবনের নিজের ধ্বংসই ডেকে আনবে। এবং সেই কারণে আইনষ্টাইন এবং রাসেল তাদের প্রচেষ্টার সিংহভাগ এবং রোজগারের বেশীর ভাগটাই পৃথিবীর শান্তি প্রচেষ্টায় ব্যয় করতো।

এলেণ্ডের চিঠি অনুযায়ী, লর্ড রাসেল মনে করতো আইনষ্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর মধ্যে কোন খুঁত নেই। তবে মানুষ এই ব্যাপারে এখনো তৈরী হয় নি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গিয়ে হয়তো বা মানুষ নিজেকে এই থিয়োরীর উপযুক্ত করে তুলবে। এবং আইনষ্টাইনের নিজেরও ধারণা ছিল যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যে হারে বিকাশ হয়ে চলেছে, তাতে এই জিনিস তার পক্ষে কখনোই সহ্য

করা সম্ভব নয়। দুই মনীষীর চিন্তাধারা এবং বক্তব্যর সঙ্গে ওপরের কথাগুলো কিন্তু ঠিক খাপ খেয়ে যায়। বানিস, হোফম্যান আর আইনষ্টাইনের ব্যক্তিগত সচিব হেলেন ডুকার্স মিলিত ভাবে 'অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, ক্রিয়েটর এ্যাণ্ড রেভেল' নামে যে বই লেখে, তাতে লিখেছিল :

হিরোসিমায় বোমা যখন ফাটে আইনষ্টাইনের ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আইনষ্টাইনের বরাবরের ভয় ছিল গণতান্ত্রিক বা একনায়কতন্ত্রী যার হাতেই এই বোমা পড়ুক না কেন, একদিন তা' ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। ব্যাপারটা ওঁর মনে নিদারুণ আঘাত হানে। আইনষ্টাইনের ভয় ছিল নাৎসীরা একবার এই অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে সারা পৃথিবীকে দমন করে বেড়াবে। সেই ভয়েই ১৯৩৯ সালে তড়িঘড়ি রুজভেল্টকে চিঠি লিখেছিলেন আইনষ্টাইন। ১৯০৭ সালে যখন প্রথম উচ্চারণ করেছিল $E=mc^2$, তখন থেকেই নিজেকে আইনষ্টাইন দোষী বলে মনে করতেন। আর সেইজন্যই সারাজীবন মানব সমাজের এই বিধ্বংসীর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। যাতে হিরোসিমা বা নাগাসাকি পৃথিবীর বুকে আর কেউ সৃষ্টি করতে না পারে।

এর থেকেই বোঝা যায় যে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী কি ভীষণ বিভীষিকা ডেকে আনতে পারে সে সম্পর্কে আইনষ্টাইনের স্পষ্ট ধারণা ছিল।

লর্ড রাসেলের আত্মজীবনী লেখক রোলাণ্ড ক্লার্ট লিখেছে যে ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তর একবার ডক্টর রাসেলকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নতুন অস্ত্র সম্পর্কে নথিপত্র দেখতে দিয়েছিল। সেই সব নথিপত্র পড়ে রাসেল এতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে যে ছুটে যায় সংবাদপত্রের অফিসে। বিশ্বশান্তির সপক্ষে লেখে ইস্তাহার। রাসেলের আশা ছিল পৃথিবীর সব চিন্তানায়কই সেই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করবে। আইনষ্টাইন মৃত্যুর ঠিক আগে সেই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দেয়।

ডক্টর জে রবার্ট ওপেনহাইমার, যাকে নাকি আইনষ্টাইনের মতো এটম বোমের গড ফাদার বলা হয়, তারও এটার অসৎ ব্যবহার

যে করা হবে সে সম্পর্কে মনে দ্বিধা ছিল না। তবে ডক্টর ওপ্‌পেন-হাইমার এটম বোমার গবেষণার কাজ থেকে কিন্তু এই কারণে নিজেকে বিরত রাখে নি। তবে আলামাগোরদোতে ১৯৪৫ সালে পরীক্ষা-মূলকভাবে যখন প্রথম এটম বোমা ফাটানো হয়, তখন কিন্তু ওপ্‌পেন-হাই মারের সেই দৃশ্য দেখে প্রচীন হিন্দুদের মহাকাব্য মহাভারতের একটা স্তবক তৎক্ষণাৎ মনে এসেছিল :

যদি এক হাজার সূর্যের মিলিত রশ্মি
একসঙ্গে আকাশের বুকে হঠাৎ
জ্বলে ওঠে ;
সেই বিশাল শক্তির পরিমাপ
করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।
আমি মৃত্যু ;
পৃথিবীকে ধ্বংসের নেশায়
মেতে উঠেছি আজ।।

আইনস্টাইন নাকি মৃত্যুর ঠিক আগে নিজের অনেক কাগজপত্তর পুড়িয়ে ফেলেছিল। মৃত্যুর ক'মাস আগে কয়েকটা মূল্যবান থিয়োরীর কাগজপত্র আইনস্টাইন পুড়িয়ে ফেলে, কারণ পৃথিবী এখনো এইসব বস্তুর জন্য প্রস্তুত হয় নি। এগুলোকে ছাড়া পৃথিবীর মঙ্গলই হবে। হয়তো বা সেই সব কাগজপত্রের মধ্যে ইউনিফাইড ফিল্‌ড থিয়োরীর আরো বিস্তারিত সূত্র এবং তার বাস্তব প্রয়োগের দিকটাও ছিল।

এলেণ্ডের কথা অনুসারে ১৯৪৩ সালে ফিলাডেলফিয়া এক্স্‌-পেরিমেণ্টের সময় জাহাজের ওপরে ডক্টর আইনষ্টাইনকে দেখা গিয়েছিল। আইনষ্টাইন নাকি ইউ এস নেভী কর্তৃক সাইন্টিফিক কন্সালটেন্ট হিসেবে নিযুক্ত ছিল ব্যুরো অফ্‌ অরডিনান্সের জন্য। সেণ্ট লুইসের জেনারেল এডমিনেষ্ট্রেশনের অফিসের নথিপত্র পরীক্ষার পর দেখা যায় ডক্টর আইনষ্টাইনকে বিশেষ একটা কাজের ব্যাপারে ডিপার্টমেণ্ট অফ নেভীতে কন্সালটেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ওয়াশিংটন ডি, সি-তে বৈজ্ঞানিক হিসেবে ৩০শে মে ১৯৪৩ সাল

থেকে ৩০শে জুন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত আইনষ্টাইন এই কাজে বহাল ছিলেন।

নেভীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আইনষ্টাইনের নিজের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক যে তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে আইনষ্টাইন তার বন্ধু গুস্তভ বাক্‌লেকে লেখে,—যতোদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে, আমি নেভীর হয়ে কাজ করবো। সুতরাং বর্তমানে নতুন কাজ আর হাতে নিতে চাই না। সেই বছরেরই আগষ্ট মাসে আবার বাক্‌লেকে লেখে, ওয়াশিংটনের নেভী অফিস অফ দ্যা সাইন্টিফিক্ রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই নিকট। কয়েক মাস আগে ডক্টর ভানেভার বুশ একটা কমিটি করেছে। বিশেষ করে আমার একটা বিষয়কে কাজে লাগাবার তাগিদায়।

আইনষ্টাইন কমিটি অথবা বিষয়টাকে কখনো ভেঙ্গে বলেন নি বা কারোর কাছে এর বেশী প্রকাশও করেন নি।

আইনষ্টাইনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং তার নিউইয়র্কের সম্পত্তির দেখাশোনার ভার ছিল ডক্টর অটো নাথানের ওপরে। ডক্টর নাথানও বলে যে ১৯৪৩ সালে নেভীর ব্যুরো অফ্ অর্ডিনান্সের কনসালটেণ্ট হিসেবে কাজ করেছে ডক্টর আইনষ্টাইন। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই অবশ্য সেই কাজ ছেড়েও দিয়েছে। মিস ব্লেকের কাজ ছিল সেকেণ্ড সেক্রেটারীর। ডক্টর সে আইনষ্টাইনের প্রিন্‌সটন অফিসে এমন জায়গায় বসতো যার ওপাশে ম্যাথমেটিশিয়ান ডক্টর ওসভাল্ড ওয়েভলেনের অফিস। আশ্চর্যের ব্যাপার, মিস ব্লেকের চাকরীর রেকর্ড কিন্তু নেভীর অফিসে রাখা হয় নি। হয়তো বা ইচ্ছে করেই। সম্ভবত ডক্টর আইনষ্টাইনের কাছে যারা যাতায়াত করে, তাদের ওপর নজরদারীর জন্য মিস্ ব্লেককে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এইসব দেখেশুনে মনে হয় আইনষ্টাইন শুধু প্রজেক্টের ব্যাপারে উপদেষ্টাই ছিল না। রীতিমতো অংশও নিয়েছিল।

নেভীর গোপন একটা রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রথম পরীক্ষাটা সফল হয় নি। তাই দ্বিতীয় বারের পরীক্ষার সময় পরীক্ষাস্থলে সশরীরে আইনস্টাইন উপস্থিত ছিলেন। যাতে দোষত্রুটিগুলো নিজের চোখে দেখে বার করা যায়। সেই সময় ওঁর প্রিনস্‌টনের অফিসেও কিন্তু আরেক আইনস্টাইন নিয়মিত হাজিরা দিতো। বলাবাহুল্য, নকল একজনকে আইনস্টাইন সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ যাতে বুঝতে না পারে যে আসল আইনস্টাইন একস্‌পেরিমেন্টের জায়গায় সশরীরে উপস্থিত। লোকে যদি আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেয়। হয়তো বা মিস্‌ ব্লেক নকল আইনস্টাইনকে আসল আইনস্টাইন ভেবে নিয়েছিল, বোঝাই যায় নেভীর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ব্যাপারটাকে নিখুঁত করার।

এখন প্রশ্ন হলো, ইউনিফাইড ফিল্‌ড থিয়োরীটা কি? টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ছাড়া এই থিয়োরীর বিশ্লেষণ আদৌ সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় থিয়োরীটার মূল তত্ত্ব এক সেট ইক্যোয়েমানের ওপরে নির্ভরশীল। যার ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক আইন বা সাইন্‌টিফিক ল'। তবে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ইউনিভার্সাল তিনটে শক্তির মধ্যের সম্পর্কটা। ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক্‌, গ্রাভিটেসানেয়াল এবং নিউ ক্লিয়ার; অর্থাৎ বিদ্যুৎ চৌম্বক, মাধাকর্ষণ ও পরমাণু। এখানে বলা হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ১৯৫৯ সালে এই ধারণার ওপরে ভিত্তি করেই নতুন দুই এলিমেন্ট জে আর পিসি অণুর আবিষ্কার হয়। এবং এই আবিষ্কার প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে সম্ভবত চতুর্থ আরেকটা শক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। যার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের নিকট সম্পর্ক আছে কিনা তা' এখনো জানা যায় নি। তবে ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে যদি এই ধরনের কোন থিয়োরী আবিষ্কৃত হয়, তবে তার সঙ্গে আলো, বিদ্যুৎ তরঙ্গ, খাঁটি চৌম্বকক্ষেত্র, একস্‌-রে, এমন কি যে কোন বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে বাধ্য। বিষয়টা এতো জটিল যে আইনস্টাইনের জীবনের বেশীর ভাগই এর পেছনে ব্যয় হয়েছে, এবং জীবনের শেষের দিকে আইনস্টাইনকে প্রায়ই

আক্ষেপ করতে শোনা যেতো যে কাজটা শেষ করার মতো অংকে জ্ঞান ওর নেই।

১৯১৬ সাল থেকে আইনষ্টাইন এক নতুন পথে চিন্তার স্রোত বইয়ে দেয়। এই নতুন পথ হলো মাধ্যাকর্ষণ কোন শক্তি নয়। টাইম এণ্ড স্পেস্ অর্থাৎ সময় এবং কালের সঙ্গে জড়ানো একটা বস্তু। সেই মহাশক্তি-ই সারা বিশ্বকে এবং সমস্ত শক্তিকে পরিচালনা করছে। আইনষ্টাইন আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে যে আমরা যাকে বস্তু বলি, ত'হলো একজায়গায় কেন্দ্রীভূত শক্তি। আরো সহজ করে বলতে গেলে আইনষ্টাইনের ধারণায় বস্তু হলো কতোগুলো শক্তির সমষ্টি মাত্র। আমাদের ধারণা কিন্তু উল্টো। সুতরাং আইনষ্টাইনের ধ্যান ধারণা আমাদের এতোদিনের শক্তি এবং বস্তু সম্পর্কে চিন্তাটাকে আমূল বদলে দেয়।

১৯৫৫ সালে ছিয়াত্তর বছর বয়সে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ উনচল্লিশ বছর ধরে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ক্রমাগত এই ধারণাটার ওপরে চিন্তা করে গেছেন আইনষ্টাইন। অনেক সময় হয়তো বা তাঁর চিন্তার জগতে পরিবর্তন এসেছে, তবে মূল বিষয় থেকে কখনোই সরে আসেন নি! মাধ্যাকর্ষণকে অংকের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব যে এর সঙ্গে অন্য শক্তির নিকট সম্পর্ক বর্তমান। বিশেষ করে বিদ্যুৎ চৌম্বকের সঙ্গে। চৌম্বকক্ষেত্র থেকে যদি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যেতে পারে যার প্রয়োগে ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেটর তৈরী হয় তা'হলে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র পাওয়াও সম্ভব। ইন্ডাসট্রিয়াল ইলেকট্রো ম্যাগনেট এই তত্ত্বের ওপরেই তৈরী, তা'হলে মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে নিশ্চয়ই এদের সম্পর্ক আছে। হয়তো বা সেই সম্পর্ক একটার সঙ্গে, অথবা দ্বৈতের সঙ্গেও রয়েছে।

আমাদের বিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ ও সুখপ্রদ করার জন্য যে মোটর গাড়ী, টোস্টার থেকে শুরু করে মাইক্রো-ওয়েভের উনোন পর্যন্ত গত শতাব্দীর জ্ঞান দ্বারা তৈরী। তা'হলে বিদ্যুতের সঙ্গে চৌম্বকের সম্পর্কের মধ্যে যে শক্তি নিহিত, সেই শক্তিকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে ত্রিকোণ একটার সঙ্গে

অপর দুটোর সম্পর্ক এখনো আমরা খুঁজে বার করতে বিফল হয়েছি।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর কুড়ি বছর পরেও তাঁর অনেক কাজের বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি। এমন কি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিদরাও সেই কাজের সূত্র খুঁজে বার করতে অক্ষম। গোঁড়া বিজ্ঞানীরা ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে বিদ্যুৎ চৌম্বক ও মাধ্যা-কর্ষণের মধ্যে আর এক শক্তির অনুমান করে। তবে সেই তৃতীয় শক্তিকে এখনো তারা খুঁজে বার করতে পারে নি। আর তা' পেরে থাকলেও পৃথিবীর চোখ থেকে তা'কে সতর্কতার সঙ্গে আড়াল করে রাখা হয়েছে। যেমন লেসার রে'র সাহায্যে গ্রাভিটেসেনায়াল-রে আবিষ্কার নাকি সম্ভব হয়েছে। এবং তার সাহায্যে এমন এক অজানা রশ্মিকে খুঁজে পাওয়া গেছে, যার দ্বারা বুদ্ধিমত্তাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো সম্ভব।

আইনস্টাইনের ধারনায় মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলার কোন স্থান নেই। তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক অতি নিকট। তাই সঠিক বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারলে দেখা যাবে মহাবিশ্বের সবকিছু একটা যৌগিক অংক মেনে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আইনস্টাইন বলতে গেলে একক এই ধারণাকে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সারাটা জীবনভোর। কোন বৈজ্ঞানিক ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী নিয়ে খুব বেশী একটা নাড়াচাড়া করে নি। কারণ এটা শুধু প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপারই নয়, তাৎক্ষণিক পুরস্কারের মূল্যও খুব বেশী একটা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। দুঃখের বিষয় যে লোহা লক্কড় নিয়ে গবেষণায় লাভ বেশী বলে বৈজ্ঞানিকরা সেদিকেই ঝুঁকে পড়েছে। তাত্ত্বিক গবেষণায় আজ আর তারা যেতে রাজী নয়। অনেক বৈজ্ঞানিকেরই আজকে ধারণা যে আইনস্টাইন এমন এক সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছেন, বাস্তবে যার অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। বস্তুতপক্ষে ওলফ্ গাঙ্ পাউলি বলে একজন বিজ্ঞানী বহুদিন ধরে ইউনিফাইড ফিল্ড পদার্থবিদ্যার ওপর কাজ করে সম্প্রতি তা

ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ পাউলির বক্তব্য হলো, ঈশ্বর যা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন, তিনি চান না মানুষ সেগুলোকে একসাথে গ্রথিত করুক।

তবে হলফ করে বলা সম্ভব নয় আইনষ্টাইন এই ক্ষেত্রে কতোটা সফল হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। ফিলাডেলফিয়া একস্পেরিমেণ্ট যদি সত্যই ওঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, তবে তা'ও এতো গোপনে রাখা হয়েছে যে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী সম্পর্কে লোকের ধারণা যে আইনষ্টাইন লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিকারের কতখানি সফল হয়েছিলেন, আজ কে তা' বলতে পারে? মৃত্যুর দু'বছর আগে আইনষ্টাইন অবশ্য ঘোষণা করেছিলেন যে বিদ্যুৎ চৌম্বক আর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে যে শক্তি নিহিত তা'কে তিনি অংকের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম। কিন্তু এলেণ্ডের মতোই আমাদেরও মনে হয় ১৯২৫ সালে ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরীর তত্ত্বগত দিকটা সম্পূর্ণ করলেও মানবত্বের খাতিরে বাস্তবের প্রয়োগ দিকটা আর প্রকাশ করেন নি।

সমস্ত তত্ত্বটা ষোলটা অদৃশ্য জটিল বস্তুর ওপরে নির্ভরশীল। যাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে অগ্রগামী কতোগুলো আংকিক সমাধান। টেনসর ইকোয়েসান। দশটা এই ধরনের কমবিনেসন প্রতিনিধিত্ব করছে মাধ্যাকর্ষণের; আর বাকী ছ'টা ইকোয়েসান হলো বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের। যারা এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছে, তাদেরও অভিমত এই ষোলটা ইকোয়েসানকে সহজভাবে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ বিষয়টির পুরো ধ্যান-ধারণাই গড়ে উঠেছে নিবিড় অংকের ওপর। ব্যাপারটা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে উঠেছে কারণ আইনষ্টাইনের নিজের বক্তব্য এই যে, এই ইকোয়েসানগুলো এখনোও পরিপূর্ণ রূপ নেয় নি। তবে এর থেকে এটা পরিষ্কার যে নিখাদ মাধ্যাকর্ষণ-ভূমির অস্তিত্ব সম্ভব হলেও বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের একক অস্তিত্ব মাধ্যাকর্ষণ-ভূমি ছাড়া সম্ভব নয়।

১৯৫৩ সালে আইনষ্টাইনের এই সম্পর্কে শেষ মতবাদের পক্ষে এই বিষয়ে ব্যাপারটাতে আর বিশেষ কিছুই যোগ করা যায় নি।

মনে হয় এই ব্যাপারে আরো কিছু যোগ হ'তে আরো অনেক বছর লেগে যাবে। ইতিমধ্যে অনেক জল নদী দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে সাগরে মিশবে। কারণ যে ইকোয়েসানগুলো এরসঙ্গে জড়িত তাদের সমাধান সহজ কথা নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে যদি এই ইকোয়েসানগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, তবে হয় তার ফলাফলকে অবহেলা করা হয়েছে, নতুবা গুপ্ত রাখা হয়েছে। আর এই ব্যাপারে কমপিউটারও অসহায়। কারণ কমপিউটারের গঠনশৈলী নিরাবয়ব কোন প্রকৃতির সমস্যার সমাধানের জন্য নয়।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্ এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করে। ডক্টর পারভিস্ মারার্ট, মারিল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটির একজন বিখ্যাত পদার্থবিদ বলে যে ডক্টর অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী এক সংকটজনক অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে। তবে সেই সংকটজনক অবস্থাটা যে ঠিক কী, তা' গোপন রাখা হয়েছে। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, সেই সংকটজনক অবস্থা সঙীন।

কিন্তু তত্ত্বগতভাবে ব্যাপারটা যতোই আশ্চর্যজনক লাগুক না কেন, ১৯৪৩ সালে নেভী হয়তো বা এই থিয়োরীর মাত্র কয়েকটা তত্ত্বকে এক বন্দর থেকে অদৃশ্যভাবে আরেকটা বন্দরে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছিল। এলেণ্ডে যে গবেষণার সাক্ষী বলে নিজেকে দাবী করে সেই গবেষণাটা কি দুর্ঘটনায় পড়ে উল্টো ফল দিয়েছিল? এমনও তো হ'তে পারে কলরাডোর ডেভিস এবং হিউজ যা বলেছে তা সত্য। এই গবেষণার দ্বারা অন্য আরেক জগতের সঙ্গে হঠাৎ-ই যোগাযোগ হয়ে যায়। উফোর সঙ্গে ব্যাপারটার কি কোথাও অদৃশ্য একটা সুতোয় বাঁধা? নাকি সবই মরীচিকা। নিছক সমুদ্র রহস্যের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ?

এর উত্তর পেতে গেলে ওয়াশিংটন ডি সি ন্যাশানাল আর্চিভিসে আমাদের আরো খোঁজ খবরের জন্য যেতে হবে।

## ॥ আট ॥

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পরস্পর বিরোধী সংবাদগুলো। যদি এলেণ্ডের অদ্ভুত সংবাদ সত্যি হয়, ওর কথা অনুযায়ী সত্যি যদি ডিই ১৭৩ অদৃশ্য হয়ে থাকে, এবং এস এস এনড্রু ফুরুসেথ জাহাজের ডেক থেকে যদি কেউ সেই একস্‌পেরিমেণ্টের প্রত্যক্ষদর্শী থেকে থাকে, অবশ্য একস্‌পেরিমেণ্টের সত্যিকারের নাম জানা না থাকায়, সাম্ভাব্য জাহাজগুলোর সম্পর্কে বিশদ খোঁজখবর করার প্রয়োজন। পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ হলেও উপায় নেই। আর এলেণ্ডের কাহিনীকে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে হলেও প্রয়োজন এর বিরুদ্ধে সত্য উদ্‌ঘাটনের।

প্রথমেই দেখা যায় যে এস এস এনড্রু ফুরুসেথ নামে জাহাজ একটা নয়, দু'টো। প্রথমটা হলো প্যাসিফিকে খনিজদ্রব্য বহনকারী ক্যারিয়ার। যেটা এখনো কাজ করে যাচ্ছে। এটাকে গবেষণার বাইরে রাখা দরকার। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এটা জলে সাঁতার কাটে নি। আর দ্বিতীয়টা হলো একটা লিবার্টি শিপ্‌। হ্যাঁ, এলেণ্ডের বর্ণনার সঙ্গে যা চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যায়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে প্যাসিফিকের সীম্যান ইউনিয়ান এনড্রু ফুরুসেথ নামটা ইউনাটেড ষ্টেটস মারিটাইম কমিশনকে একটা জাহাজের নাম রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। মিষ্টার এনড্রু ফুরুসেথ সেই ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘদিন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কাজ করছে। সেই বছরেরই অক্টোবর মাসে 'হাল নম্বর ৪৯১' এক নম্বর ইয়ার্ড থেকে রিচমণ্ড ক্যালিপের কাইজার ইনডাসট্রির পার্মানেণ্ট মেটাল ডিভিসনের তরফ থেকে জলে ভাসানো হয়। জেস্নপের কাছে এলেণ্ডের চিঠির অংশটাও সত্য যে জলে ভাসানোর কয়েকদিন পরেই জাহাজটা সান্‌ ফ্রানসিস কোর মাটসন্‌ নেভীগেসন কোম্পানীকে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিতে দেওয়া হয়। পরের চার বছরের জন্য উক্ত কোম্পানি জাহাজটার মালিকানা লাভ করে। ১৯শে অক্টোবর এনড্রু ফুরুসেথ সান্‌ ফ্রানসিসকো শহরের বন্দর ছেড়ে

পাঁচ মাসের জন্য প্যাসিফিক ট্যুরে বেরোয়, সেই সময় প্যাসি-ফিকের যে অংশ যুদ্ধ এলাকা বলে চিহ্নিত সেখানে যাওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে হাজির হয় এসে প্যাসিফিকের দ্বীপ লুগানভিলেতে। নর্থ আফ্রিকার সরবরাহ ব্যবস্থা তখন বিপর্যস্ত। সুতরাং আটলান্টিকের সেই সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য এনড্রু ফুরুসেথকে নিযুক্ত করা হয়। মাটসন্ কোম্পানির রেকর্ড অনুযায়ী এনড্রু ফুরুসেথ ১০ই মার্চ তারিখে দীর্ঘ মেয়াদী এক সমুদ্রযাত্রায় বেরোয় এবং নিউইয়র্ক বন্দরে এসে হাজির হয় ৬ই মে। বাইশ দিন ধরে বন্দরে টুকিটাকি সারানো-টারানোর পরে এনড্রু ফুরুসেথ নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে আলজেরিয়ার ওরান বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। নিরাপদে সেই ওরান বন্দরে পৌছায় ১৭ই জুন তারিখে।

ফেরার পথে মোষ্টে গেলাম এবং জিব্রালটার থেকে মাল তুলে নিয়ে আবার নিউ ইয়র্ক বন্দরে এসে হাজির হয় জুলাই মাসের ২৩ তারিখে। পরপর তিন সপ্তাহের বিরতি। ১৯৪৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে ফুরুসেথ আবার যাত্রা করে নরফোল্ক বন্দরের উদ্দেশ্যে নরফোল্ক যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেই বন্দর থেকে মাল বোঝাই করে নিয়ে আটলান্টিক পাড়ী দেওয়া। ঠিক এইখান থেকেই রহস্যের সুত্রপাত। এইবারের যাত্রায় সারেঙদের মধ্যে নতুন সদ্য সী-ম্যান স্কুল থেকে বেরিয়ে আসা এবং এক যুবকের নাম দেখা যায়। কার্ল এম অ্যালেন। আরো রহস্যের ব্যাপার জাহাজটার তীর ঘেঁষে চলার শুরু থেকে ওর যাত্রা বদলে সেই মিষ্টার অ্যালেনকে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় নরফোল্ক বন্দরে গিয়ে জাহাজটায় উঠতে। অর্থাৎ স্থলপথে নরফোল্ক যেতে। আর এই স্থলপথে যাওয়ার সময় অ্যালেন এক দিনের বিরতি করেছিল ফিলাডেলফিয়ায়। নরফোল্ক বন্দরে অ্যালেন হাজির হয় ১৬ই আগষ্ট সকালবেলায়, আর ফুরুসেথ নিউপোর্ট নিউজ ত্যাগ করে সকাল দশটা বেজে আঠারো মিনিটে। এটা হলো জাহাজটার তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা। গন্তব্যস্থল কাসাব্লাংকা। অনেকগুলো জাহাজের সঙ্গে একসঙ্গে।

৩ঠা অক্টোবর ফুরুসেথ আবার নিউপোর্ট নিউজে নোঙর করে ছোটখাটো সারাই আর মাল ভর্তি করার জন্য। অক্টোবরের ২৫ তারিখ পর্যন্ত সেই কাজ চলে। সেই তারিখে ফুরুসেথ আবার যাত্রা করে ওরানের উদ্দেশ্যে। এবারেও সারেঙদের মধ্যে ছিল কার্ল এম অ্যালেন নামের সেই যুবক। ১২ই নবেম্বর জাহাজটা নিরাপদেই ওরান বন্দরে পৌঁছায়, এবং ১৯৪৪ সালের ১৭ই জানুয়ারীর আগে জাহাজটা আর আমেরিকার কোন বন্দরে ভেড়ে নি। এর কয়েকদিন পরেই সারেঙ কার্ল এম অ্যালেন জাহাজ ছেড়ে দিয়ে ডেক-ক্রু হিসেবে বদলী হয় এস এল নিউটন ডি বেকার নামের জাহাজে।

ডি ই ১৭৩ জাহাজটা ইউ এস এস এথরিজ ডেসট্রয়ার নামেই পরিচিত ছিল। রেকর্ড নেড়ে চেড়ে দেখা যায় জাহাজটার জীবনে কোন রকম অস্বাভাবিক ব্যাপারই ঘটে নি। নথিপত্র অনুযায়ী এলরিজকে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ সালে ফেডারেল শিপ বিল ডিং এবং ড্রাই ডকে আনা হয়। লম্বায় তিনশো ছ'ফিট্ আর ওজনে এক হাজার দু'শো চল্লিশ টনের ডেসট্রয়ার এটা। তবে মাল বোঝাই করার পর ওজন দাঁড়ায় এক হাজার পাঁচশো কুড়ি টন। এর প্রায় পাঁচ মাস পরে জুলাই মাসের ২৫ তারিখে এলরিজকে জলে ভাসানো হয়। তবে সরকারী ভাবে জলে ভাসানোর উৎসব পালন করা হয় ২৭শে আগষ্ট। নিউ ইয়র্ক নেভী ইয়ার্ডে। সেই উৎসবে লেফটনান্ট চার্লস আর হ্যামিলটন ইউ এস এন আর এলরিজের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ডিপার্টমেন্ট আর নেভীতে এলরিজের যে ইতিহাস লেখা আছে, তা' হলো :

সময় নষ্ট না করে ইউ এস এস এলরিজকে সেপ্টেম্বর মাসেই জাহাজ পাহারার কাজে বারমুডা এবং ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার অঞ্চল-গুলোতে নিযুক্ত করা হয়। ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ পর্যন্ত এলরিজ সেই দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করে চলে। তারপরে ব্লক আইল্যাণ্ডে তিনদিনের শিক্ষাদান পর্ব সমাপ্ত করে এলরিজ। ব্লক আইল্যাণ্ড অঞ্চল থেকে নীচের দিকে নেমে আসে হ্যামটন রোড, ভার্জিনিয়ায়।

এইখান থেকেই এলরিজের সুরু হওয়ার কথা সমুদ্রে অন্যান্য জাহাজ গুলোর পাহারাদারীর কাজ। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এলরিজ্ তার সংক্ষিপ্ত পাহারাদারীর কাজ চেসা পেকে বে' তে সেরে আটলান্টিকের দিকে যায়। বিরাট বড় এক মার্চেন্ট জাহাজের কনভয়ে পাহারাদারীর দায়িত্ব নিয়ে।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের ৯ই মে পর্যন্ত এলরিজ, মেডিটোরিয়ানে সৈন্য এবং মাল বহনকারী জাহাজগুলোর পাহারাদারীর কাজ করে। এই জাহাজগুলো মিত্র শক্তির তরফ থেকে যুদ্ধের কাজে নর্থ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত করতো। নথিপত্র খুঁজে দেখা যায় এলরিজ্ ন'বার সমুদ্রযাত্রা করেছিল; এবং কনভয়গুলোকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিল কাসাব্লাংকা বিজারেটে এবং ওরানে।

আটলান্টিকের পর এলরিজকে বদলী করা হয় প্যাসিফিকে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এলরিজ সেখানেই ছিল। নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর ১৭ই জুন, ১৯৪৬ সালে এলরিজকে কমিশনের বাইরে নিয়ে এসে অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫১ সালের ৫ই জানুয়ারী মিউচুয়াল ডিফেনস এ্যাসিষ্টেনটস প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ্যালরিজকে গ্রীসের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হয়। গ্রীকরা জাহাজটার নাম বদলে নতুন নামকরণ করে, লিঁয় বা লায়ন। হয়তো বা এলরিজ আজও সেখানে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

ব্যাপারটাকে এতোই সাদামাটা বলে মনে হয় যে এলেণ্ডের কাহিনী জানা না থাকলে এলরিজের সম্পর্কে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করাই সম্ভব নয়। তবে এলেণ্ডের আলোয় পরীক্ষা করলে কিন্তু মনে হয় অনেক কিছুই রঙের আড়ালে ইচ্ছে করেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

সুরুরও সুরু আছে; যদি দেখা যায় এলরিজ্ আর এস এস ফুরুসেথকে একই জায়গায় একদিনে দেখা পাওয়া সম্ভব হয়, আর কার্ল এম অ্যালেনকে পাওয়া যায় ফুরুসেথের সারেঙ দলে,

তবে এলেঙের কাহিনীর ওপর যতোটুকু সন্দেহের বাষ্প জমেছে, তা' এক ফুৎকারেই নিভে যাবে। আর অপরদিকে যদি এক জায়গায় এলরিজ আর ফুরুসেথ জাহাজ দু'টোকে না পাওয়া যায়, তবে এলেঙের কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। মূর যখন প্রথম জাহাজদু'টোর লগ বুক পরীক্ষা করে, তখনই বোঝা যায় যে যা হওয়া উচিত ছিল, তা' নেই। লগ্ বুক পরীক্ষার পর রহস্যটা যেন আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

প্রথমত, এলরিজের ২৭শে আগস্ট, ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেক লগ্ বুক খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এই সময়কার ফুরুসেথের লগ্ বুকটা কর্তৃপক্ষের আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এলেঙে ফুরুসেথে সারেঙ হিসেবে কাজ করেছে ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩ সাল থেকে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। সুতরাং কিছুটা অনুমান আর বাকীটা পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এগোতে হয়। আর সেই এগোতে গিয়েই নীচের তথ্যগুলো ধরা পড়ে।

মাটসন্ নেভীগেসন্ কোম্পানির কাছে যে নথিপত্র আছে, তা'তে দেখা যায় এই সময়ে ফুরুসেথ জাহাজটা দু'বার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়েছে। প্রথম সমুদ্রযাত্রা সুরু হয়েছিল ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৩ সালে। নিউ ইয়র্ক থেকে ফুরুসেথ যাত্রা করেছিল নরফোল্ক বন্দরে, আর সেখান থেকে নর্থ আফ্রিকায়। আর দ্বিতীয় যাত্রা করেছিল ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে। লেনহাভেন রোড। ভার্জিনিয়া থেকে আলজিরিয়ার ওরান বন্দরে। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে লেনহাভেন রোড কিন্তু নরফোল্ক অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে। এলেঙের জন্যই ফুরুসেথের প্রথম সমুদ্রযাত্রা বিলম্বিত হয়েছিল ১৬ই আগষ্ট পর্যন্ত। এলেঙের সপ্তাহের শেষের দিনটা ফিলাডেলফিয়ায় কাটিয়ে নরফোল্ক বন্দরে এসে ফুরসেথ জাহাজটা ধরেছিল। দ্বিতীয়বারের ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৪ সালে। তার ক'দিন পরেই এলেঙে জাহাজের চাকরী ছেড়ে চলে যায়।

নেভী ডিপার্টমেন্টের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় এলরিজ্‌কে জলে ভাসানো হয়েছিল ২৫শে জুলাই, ১৯৪৩ সালে। নে ওয়ার্ক নিউ জার্সিতে। তবে কমিশন করা হয় ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪৩ সালে। নিউইয়র্ক নেভী ইয়ার্ডে। অবশ্য এলরিজ্‌কে সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে কাজে নামানো হয়। পরীক্ষামুলক ভাবে, বারমুডায়। ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এলাকায়। ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এলরিজের কার্যক্ষমতা সম্পর্কে হাতে কলমে পরীক্ষা নিরিক্ষা চলে। এই রেকর্ডেই দেখা যায় যে ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৪ সালে এলরিজ প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বেরোয়। আর নিউইয়র্ক বন্দরে সেই সমুদ্রযাত্রা শেষ করে ফিরে আসে ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

যদি ওপরের ব্যাপারগুলোকে স্বীকার করে নেই, তবে এ সত্যও স্বীকার করা উচিত যে তু'টো জাহাজের মোলাকাত্‌ কখনই হয় নি। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওপরের খবরগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য? রহস্যজনক ভাবে জাহাজতুটোর লগ্‌ বুক অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা মনের ওপরে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে তোলে বৈ কি। তা'তে রহস্যটা আরো ঘনীভূতই হয়। সমাধানের পথ মেলে না।

তবে এলরিজ সম্পর্কে পরের খবরগুলোয় কিন্তু নেভী ডিপার্ট-মেন্টের সরকারী রিপোর্ট সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রাখে। বিশেষ করে একটা দলিল। দলিলটা হলো এলরিজের কমাণ্ডারের রিপোর্ট। প্রতিটি আক্রমণের রিপোর্ট সেই জাহাজের কমাণ্ডারের রাখার নিয়ম। তা'তে দেখা যায় এলরিজ অ্যান্টি সাবমেরিন আক্রমণ চালিয়েছিল সমুদ্রের ওপরের একটা জাহাজকে তাক করে। ঘটনাটা ঘটেছিল ২০শে নভেম্বর, নর্থ আটলান্টিকে। অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী এলরিজ সেপ্টেম্বরের প্রথমদিক থেকে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি বারমুডায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আর ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৪ সালে প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বের হয়। এলরিজের কমাণ্ডার লেফটন্যান্ট সি আর হ্যামিলটনের রিপোর্টে দেখা যায় ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৩ সালের বেলা দেড়টার সময় শত্রুপক্ষীয় এক সাবমেরিনের ওপর এলরিজ সাতটা ডেপ্‌থ চার্জ করেছিল।

তখন এলরিজ ইউ জি এস ২৩ কনভয়কে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিল ইউনাইটেড ষ্টেট্সের দিকে। রিপোর্ট অনুযায়ী এলরিজের অবস্থান তখন ল্যাটিচ্যুড ৩৪৬০৩´ উত্তরে, লঙিচ্যুড ৮০৫৭´ পশ্চিমে।

এই অবস্থান পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে এলরিজ্ তখন খুব বেশী হলে নর্থ আফ্রিকার কাসাব্লাংকা উপকূল থেকে দু'শো মাইল আর বারমুডা থেকে তিন হাজার মাইল দূরে।

দ্বিতীয় সংবাদটা কিন্তু এলরিজের অসম্পূর্ণ ছবিকে সম্পুর্ণ করে দেয়। এলরিজের ডেক লগ্ বুক খুঁজে না পাওয়া গেলেও ইনজিনীয়ার লগ্ বুক পাওয়া যায়। যদিও বিস্তারিত কিছু তা'তে পাওয়া সম্ভব নয়। পাওয়া যায়ও নি। তবে এর থেকে যেদিন-গুলোতে ঘটনাটা ঘটেছিল, সেই দিনগুলোয় এলরিজের অবস্থান কোথায় ছিল তা' পাওয়া যায়। ডেক লগ্ বুকের ফাইলে কিন্তু এই নম্বরগুলো পাওয়া যায় নি। এতে দেখা যায় এলরিজ্ ২রা নভেম্বর ব্রুকলীন বন্দর ছেড়ে জি ইউ এস ২২শের একটা জাহাজের সাহায্যে গিয়েছিল। জাহাজটা দক্ষিণ থেকে হঠাৎ ধেয়ে আসা দেরী করা ঝড়ে পড়ে বিপর্যস্ত। তা'হলে এটাই কি সেই জাহাজ এস এস ফুরুসেথ! যেটা ২৫শে অক্টোবর নরফোল্ক—লেনহাভেন রোড ছেড়ে যাত্রা করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ফুরুসেথ কনভয়ের একেবারে শেষে ছিল। তার মানে ডি ই ১৭৩ সদা সর্বদা জাহাজটাকে নজরে রেখেছিল। আর ২০শে নভেম্বর এলরিজের কাসাব্লাংকার কাছে অবস্থান দেখে মনে হয় এলরিজ্ ফুরুসেথ সহ জি ইউ এস ২২ কনভয়কে নর্থ আফ্রিকা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। এখানে হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কনভয়টা নর্থ আফ্রিকায় পৌঁছেছিল ১২ই নভেম্বর। আর ফিরতি পথে এলরিজ্ পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছিল ইউ জি এস ২৩ কনভয়কে। সেই সময় একটা সাবমেরিনকে আক্রমণ করে এলরিজ্। এই ঘটনাটাই গত চৌত্রিশ বছর ধরে নেভী গোপন করে রেখেছে। সুতরাং এমন আরো অনেক ঘটনাই লুকোনো থাকতে পারাটা আশ্চর্যের নয়।

ওপরের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে আফ্রিকার পথে কনভয়ের মধ্যে ফুরুসেথ আর এলরিজ্ পরস্পর দৃষ্টি সীমানার মধ্যে ছিল। কিন্তু নেভীর পক্ষে এতোবড় একটা কনভয়কে প্রত্যক্ষদর্শী রেখে কি গোপন এই ধরনের কোন একস্‌পেরিমেন্ট চালানো সম্ভব? মনে হয় না। তদুপরি এলেণ্ডের চিঠি অনুযায়ী একস্‌পেরিমেন্টটা ফিলাডেল-ফিয়া ডক ইয়ার্ড এবং সমুদ্রের ওপর করা হয়েছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে উপকূলের কাছাকাছি দরিয়ায়। এলেণ্ডের তারিখ অনুযায়ী একস্‌পেরিমেন্টটা করা হয়েছিল অক্টোবর মাসের শেষাশেষি। যদিও কনভয়ের সমুদ্রযাত্রার সময়ের সঙ্গে তা' মিলে যায়, তবে আনুসঙ্গিক ঘটনাক্রমে তা' অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিশেষ করে যখন দেখতে পাই ফিলাডেলফিয়া নয়, এলরিজ্ ব্রুকলীন বন্দর ছেড়ে জি ইউ এস ২২ কনভয়কে পাহারা দিতে বেরিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি রেকর্ডে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না যে এলরিজ্ ফিলাডেলফিয়া বা ধারে কাছে কখনো ছিল। হ্যাঁ, নির্মাণের সময় ছাড়া। কারণ এলরিজকে তৈরী করা হয়েছিল নেওয়ার্কে। এলেণ্ডে চিঠিতে আরো বলেছে যে নাবিকদের ওপর এই একস্‌পেরি-মেন্টের প্রতিক্রিয়া ফিলাডেলফিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় না যে এলেণ্ডে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে ফিলাডেলফিয়ায় ছিল। কিন্তু এলেণ্ডে আগষ্ট মাসে যে ফিলাডেলফিয়ায় ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। আর ঠিক এই সময়েই নেওয়ার্কে নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে এলরিজ্ অপেক্ষা করছিল নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য। এলেণ্ডের চিঠি অনুসারে খবরটা প্রকাশিত হয়েছিল শীত বা বসন্তকালীন সংবাদপত্রে। গ্রীষ্মের কোন সংখ্যায় নিশ্চয়ই নয়। হতে পারে এলেণ্ডের স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাহলে সেটাও পরীক্ষা করে দেখা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

ঠিক এই সময়েই মূর, তৎকালীন এক সাংবাদিক, যুদ্ধের সময় যে জাহাজের কমাণ্ডার হিসেবে কাজ করেছে, তাদের কাছ থেকে একটা চিঠি পায়। সেই চিঠি অনুসারে ১৯৪৩ সালের প্রথম ঝড়ের পরেই

এলরিজ কে বারমুডায় পাঠানো হয়। এর আগে অবশ্য এলরিজ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নোঙর করেছিল। ওর স্মৃতি অনুযায়ী ঘটনাটা ঘটেছিল জুলাইয়ের শেষের দিকে অথবা আগষ্টের প্রথমে, ১৯৪৩ সালে। ঘটনাটা সম্পর্কে ওর বক্তব্য যে জাহাজটায় কোন সিগন্যাল ফ্ল্যাগ ছিল না। বা অন্য জাহাজের সঙ্গে কোন বার্তা বিনিময়ও করে নি।

জাহাজটার এই অস্বাভাবিক ব্যবহার আশ্চর্য্যজনক। তারচেয়েও আশ্চর্যের হলো এই জাহাজটাই যদি এলরিজ হয়ে থাকে, তবে তাকে নেওয়ার্কে জলে ভাসানোর কয়েকদিন পরেই বারমুডায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত জাহাজটার নির্মাণ কাজ তো পুরোপুরি শেষ হওয়ার কথা নয়; এবং সেই জাহাজে তারপরেই মাসখানেক অব্দি কোন সারেঙ নিয়োগ করা হয় নি।

এই সব জটিলতার সম্ভাব্য উত্তর হ'তে পারে, হয়তো বা অফিসার ভদ্রলোক ভুল করেছেন; অথবা এলরিজকে নেওয়ার্কে ২৫শে জুলাইয়ের আগেই জলে ভাসানো হয়। আমেরিকান নেভীর রেকর্ডে সেই সত্যের বিন্দুমাত্র আভাস রাখা হয় নি।

এবার দেখা যাক এলরিজ সম্পর্কে গ্রীকরা কি বলে? কারণ

নেই। এখানেই ব্যাপারটা আরো আশ্চর্যের লাগে। গ্রীকদের রেকর্ড অনুযায়ী এলরিজকে ২৫শে জুন তারিখে জলে ভাসানো হয়েছিল। ২৫শে জুলাই নয়। ঠিক তিরিশ দিনের তফাৎ। তারো অবাক ব্যাপার গ্রীক নেভীতে যখন এলরিজকে কাজে লাগানো হয়, রেকর্ডে ক্ষমতার জায়গায় বলা হয়েছে এক হাজার দু'শো চল্লিশ টন। খালি অবস্থায় এক হাজার ন'শো টন। মাল ভর্তি অবস্থায় জল সরাতে জাহাজটা সক্ষম। তার মানে তিনশো আশী টনের ফারাক। একজন অভিজ্ঞ নেভী অফিসারের মতামত হলো, এই ফারাক হ'তে পারে একমাত্র জাহাজটা বিক্রীর আগে যদি এমন কোন বস্তু জাহাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে, যার ওজন তিনশো

আশী টন। তা'হলে সেটা কি কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি? যেটা এলরিজে ছিল এবং যার ওজন তিনশো আশী টন।

এইবার সমস্ত ব্যাপারটাকে যদি একসঙ্গে গ্রথিত করা হয়, দেখা যাবে এলরিজকে ২৫শে জুলাই নয়, ২৫শে জুন জলে ভাসানো হয়েছিল আগষ্টের আগে পর্যন্ত জাহাজটা নেওয়ার্ক ফিলাডেলফিয়া অঞ্চলে ছিল। জুলাইয়ের শেষের দিকে অথবা আগষ্টের প্রথম দিকে বারমুডায় গিয়েছিল এলরিজ। আর সর্বোপরি, এই জাহাজ সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত যে অফিসিয়াল 'রেকর্ড' রাখা হয়েছিল, তা সবই মিথ্যা।

পুরো ব্যাপারটার বিস্তারিত বিশ্লেষণের পরে মূর আরেক কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যুদ্ধের সময়ে নেভীর রাডার প্রোগ্রামে যে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে যতোটুকু সে বলেছে, তারচেয়ে অনেক বিস্তারিত ভাবে ব্যাপারটাকে সে জানে। রাডার প্রোগ্রামে বিজ্ঞানী হিসেবে নিযুক্ত থাকায় ফিলাডেলফিয়া একস্পেরিমেণ্টের ব্যাপারটাও হয়তো বা তার বিশদ ভাবে জানা। বিজ্ঞানী কিছুতেই তার নাম প্রকাশে রাজী না হওয়ায় নামটা অপ্রকাশিতই রাখা হলো। তাকে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়,—কমাণ্ডার, বলতে পারেন এই প্রজেক্টের পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য কিভাবে জাহাজটাকে জোগাড় করা হয়েছিল?

উত্তরে কমাণ্ডার বলে,—আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ১৯৪৩ সাল নাগাদ গবেষণার জন্য জাহাজ পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। কমিশন হওয়ার পরেই জাহাজ সোজা চলে যেতো যুদ্ধে অংশ নিতে। সেই-খান থেকে জাহাজ ছিনিয়ে নেওয়া একরকম অসম্ভবই বলা চলে। তবে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল জলে ভাসানো, অবশ্য কমিশনের মধ্যবর্তী সময়ে যদি জাহাজটাকে গবেষণার কাজে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার জন্য ওপর মহলে যথেষ্ট দহরম মহরমের প্রয়োজন। প্রতিপত্তি থাকাও আবশ্যক। আর যে বিজ্ঞানী এই ধরনের গবেষণা চালাবে, তাকে প্রমাণ করতে হবে যে গবেষণার ফলশ্রুতি যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচণ্ড রকমের সহায়ক হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন

খুব কম সংখ্যক লোকের পক্ষেই জাহাজ জোগাড় করা সম্ভব। অন্তত সেই সময়কাল বিবেচনা করলে।

এবারে সেই কমাণ্ডারকে প্রশ্ন করা হয় যে ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি ম্যানহাটন প্রজেক্টের সাফল্যের শিখা দেখা দেয় এবং সেই বছরে মিলিটারী রিসার্চের দরুণ প্রচুর খরচ খরচাও হয়ে যায়। সুতরাং অন্য কোন প্রজেক্টের ব্যাপারে তখন কি কোন রকম খরচার ঝুঁকি নেওয়া ডিফেন্সের পক্ষে সম্ভব ?

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিক থেকে সমস্ত একস্‌পেরিমেন্টের এবং প্রজেক্টের প্রতি-ই সরকারী মনোভাব বদলে যায়। কারণ সেই সময় থেকেই যুদ্ধের শেষ প্রায় দৃষ্টিগোচর হ'তে সুরু করেছে। সুতরাং যে কোন প্রজেক্ট বা একস্‌পেরিমেন্টের ক্ষেত্রেই একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে,—এই যুদ্ধে তার ফলাফল ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা ? যারা তাদের একস্‌পেরিমেন্টের বিষয়ে স্থির নিশ্চিত নয়, তাদের চটপট কয়েকটা পরীক্ষা চালিয়ে তার ফলাফলের ব্যবহার সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হ'তে বলা হয়। আর যাদের সেই ফলশ্রুতির ব্যাপারে তখনো মনে সন্দেহের মেল হয়ে গেছে, তাদের প্রতি সরকারী আদেশ হয় অন্য কোন মূল্যবান ব্যাপারে মনোযোগ দিতে। আর যেসব প্রজেক্টের সেই সময়ের মধ্যে ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়, তাদের প্রজেক্ট কোল্ড ষ্টোরেজে রেখে দেওয়া হয়।

এইবার কমাণ্ডারকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার কি মনে হয় না জাহাজটা মিলিটারী সাইন্টিফিক কোন বিশেষ রিসার্চের জন্য জোগাড় তরা হয়েছিল।

উত্তরে কমাণ্ডার বলে,—আপনারা যে প্রজেক্টের কথা বলছেন, আমি সেই প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। তবে আমার মনে হয় ১৯৪৩ সালে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই রকম, এই বছরেই যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারো, তবে আমরা উৎসাহী। কারণ সবটাই নির্ভর করছে তার ফলাফলের ওপর। নইলে আপাতত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোলা থাক। যুদ্ধের পরে আবার ব্যাপারটা

নেড়ে চেড়ে দেখা যাবে। কমাণ্ডারকে আবার প্রশ্ন করা হয়, ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেণ্ট প্রজেক্টের ব্যাপারে আপনার কি কিছু স্মরণে আছে? যেমন কি করে প্রজেক্টের সুরু হয়েছিল? যারা ছিল এই প্রজেক্টের পেছনে এবং তারা এই প্রজেক্টের' থেকে কি ফলাফল পাবে বলে আশা করেছিল?

দেখুন, প্রজেক্টটা কোথা থেকে এলো এবং এর পেছনে কে ছিল তা' আমার ঠিক জানা নেই। আমি তো আগেই বলেছি প্রজেক্টটার ব্যাপার স্যাপার আমার জানার বাইরে। তবে আমি বিশ্বাস করি দু' সপ্তাহের জন্য ওরা ফিলাডেলফিয়া অথবা নেওয়ার্ক থেকে জাহাজটা পেয়েছিল। তবে যতোদুর স্মরণে আছে, ওরা ডেলভারে এবং উপকূলে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা চালায়। বিশেষ করে রাডার ডিটেকসান যন্ত্রপাতির ওপরে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র শক্তির পরীক্ষা; এর বেশী বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমার জানা নেই। আমার ধারণা এবং যতোদুর মনে হয় ধারণাটা সঠিক। অন্যান্য জাহাজের ওপরে এবং তীর বরাবর রিসিভিং ইকুাপ্‌মেণ্ট বসানো হয়েছিল যাতে রেডিও লো এবং হাই ফ্রিকোয়েন্সী রাডারকে ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিফলিত করা যায়। সন্দেহ নেই ছবিটার সীমানার মধ্যেই একস্‌পেরিমেণ্টটাকে করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, একটা ব্যাপার আমার জানার মধ্যে পড়ে যে সামগ্রিক অ্যাবজরপসান এবং রিফ্রাকসানের ওপর প্রচণ্ড পরিশ্রম করা হয়েছিল। আর এই ধরনের প্রজেক্টের জন্যই তার দরকার পড়ে।

কমাণ্ডার আরো বলে যে আমার মনে হয় না কোন জাহাজ কমিশন হওয়ার পরে সমুদ্রের ওপর এতোবড় একটা কনভয়কে সাক্ষী রেখে এই ধরনের একস্‌পেরিমেণ্ট চালানো সম্ভব। বিশেষ করে ১৯৪৩ সালে কয়েক শো টন মূল্যবান ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আটলান্টিক দরিয়ায় যখন জার্মান সাবমেরিনের কব্জায়, তখন তাদের দয়ার ওপরে নির্ভর করে কোন গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার মতো বোকামীতে নিশ্চয়ই ইউ এস এস নেভী রাজী হবে না।

ওপরের কথাবার্তাগুলো যে মূল্যবান সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

কারণ এতে বোঝা যায় যে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্ট কখন এবং কোথায় সঠিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং ফিলাডেলফিয়া নেওয়ার্ক ডক ইয়ার্ডের আশে পাশেই যে একস্‌পেরিমেন্টটা সংঘটিত হয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। যদি দু' তিন সপ্তাহের জন্য জাহাজটা পেয়ে থাকে আর গ্রীক্‌দের রেকর্ড অর্থাৎ জাহাজটা জলে ভাসানোর তারিখ ২৫শে জুন সঠিক হয়, তবে ভাসানোর পরেও বেশ কয়েক সপ্তাহ পাওয়া গিয়েছিল জাহাজটার নির্মাণ কাজ সমাপ্তির জন্য। অর্থাৎ ফিলাডেলফিয়া একসপেরিমেন্ট নইলে সংঘটিত হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ২০শে জুলাই থেকে ২০শে আগষ্টের মধ্যে। এবার কিন্তু পুরো ব্যাপারটার সহজ ব্যাখ্যা মেলে। জুলাই মাসের শেষের দিকে ঝড়ের জন্য হয়তো বা বাধ্য হয়ে এলব্রিজকে বারমুডায় যেতে হয়েছিল। কার্লস এলেণ্ডে ১৩ই আগষ্ট থেকে ১৫ই আগষ্ট যখন ফিলাডেলফিয়ায় ছিল, তখনই সংবাদটা ফিলাডেলফিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একস্‌পেরিমেন্টটা নিশ্চয়ই সেই সময় প্রায় শেষ পর্বে উপনীত। এবং জাহাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সারেঙ রেখে দিয়ে বাকী সবাইকে ছুটি দিয়ে উপকূলে নামিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাদেরই রাখা হয়েছিল, যাদের ছাড়া জাহাজ চালানো সম্ভব নয়। তা'হলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ঘটেছিল শুক্রবার অর্থাৎ ১৩ই আগষ্ট অথবা শনিবার ১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যায়।

রেকর্ড অনুযায়ী এলব্রিজ নেওয়ার্ক ছেড়ে ব্রুকলীনের দিকে যাত্রা করে ১৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার আর কমিশনের জন্য ব্রুকলীনে পৌঁছোয় ১৮ই আগষ্ট বুধবার। ফুরুসেথ নরফোল্ক বন্দর ছাড়ে সোমবার অর্থাৎ ১৬ই আগষ্ট এবং কনভয়ের সঙ্গে ১৭ই আগষ্ট যাত্রা করে পুব মুখো পাড়ী দেয় আফ্রিকার দিকে। সুতরাং ডেলভার থেকে যাত্রা করে এলব্রিজের সঙ্গে দেখা হওয়া ফুরুসেথের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ এলব্রিজ্‌ও ১৭ই আগষ্ট তারিখে ব্রুকলীনের দিকে যাত্রা করেছিল। এই দেখা সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই খুব অল্প সময়ের জন্য হয়েছিল। কারণ এলব্রিজের গন্তব্যস্থল আর গতি বিবেচনা করলে তাই মনে হয়। যদি এটা একসপেরিমেন্টের

শেষ পর্যন্ত হয়ে থাকে, তবে এলেণ্ডের দেওয়া সময়টাই নঠিক হওয়া সম্ভব। নভেম্বরে নয়।

এখনো একটা বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। সত্যি কি ঘটনাটা ঘটেছিল ! উত্তরটা কিন্তু ইতিবাচক দাঁড়িপাল্লার দিকেই ঝোঁকে বেশী।

## ॥ নয় ॥

জাহাজগুলোর রেকর্ড নিয়ে তো অনেক নাড়াচাড়া হলো; এবারে এলেণ্ডে ডক্টর জেসুপকে লেখা দ্বিতীয় চিঠিটার এক জায়গায় হয়তো বা পুরো ব্যাপারটার চাবিকাঠি লুকোনো আছে। এলেণ্ডের চিঠি অনুসারে, যদিও আইনষ্টাইন ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিল, তবে নেভী পুরো ব্যাপারটাকেই আবার খতিয়ে দেখে। যাতে শীঘ্র থিয়োরীটার ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সময়ও যাতে কম লাগে। যদি এলেণ্ডেকে বিশ্বাস করে নেওয়া হয়, তবে সেই গাণিতিক ছকের ওপরেই তত্ত্বটা গড়ে উঠেছিল, যার পরিণতি ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেণ্টে।

এখানে বলা হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এলেণ্ডে ডক্টর জেসুপকে চিঠিতে জানিয়েছিল যে, এই খতিয়ে দেখার ব্যাপারটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিল ডক্টর ফ্রাংকলিন রেনো। যাকে এলেণ্ডে মাঝে মধ্যেই 'আমার বন্ধু' বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে।

এখন এই ডক্টর ফ্রাংকলিনকে যদি খুঁজে বার করা যায় এবং তার কাছে যদি তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়, তবে এই রহস্যের ওপরে এতো বছরের জমা কুয়াশা সরে যাবে। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা বর্তমান। অনেকেই এই রেনোকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যক্তিকে খুঁজে না পেয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই তাই গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বেশ কয়েক বছরের ক্রমাগত চেষ্টার পর এটা বলা সম্ভব হয় যে ডক্টর রেনো আর যাই হোক কল্পিত পুরুষ নয়। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর বছরখানেক আগে ডক্টর

রেনো মূরের কাছে স্বীকার করেছে যে আগেকার চিঠিতে অনেকটাই সত্য রয়েছে।

আগের গবেষকরা খুঁজে পায় নি কারণ তারা যাকে খুঁজেছিল তার নাম ফ্রাংকলিন রেনো নয়। যদিও পেনসিলভেনিয়ার রাস্তার মানচিত্রে মানুষটার হদিশ রয়েছে।

পেনসিলভেনিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল তৈল সমৃদ্ধ। ইউ এস রুট ৬২ ধরে কিছুটা এগোলে তৈল শহরের কাছেই ফ্রাংকলিন-পেনসিভেনিয়া নামে ছোট্ট শহরটা। ভেনাগো কাউন্টির মধ্যে প্রায় আট হাজার লোক অধ্যুষিত শহর। বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। মাইল পাঁচেক পুবে সেই রাস্তার ওপরেই ফ্রাংকলিন, আর তৈল শহরের মাঝামাঝি জায়গায় রেনো হলো ছোট্ট একটা গ্রাম। তবে উলফ. হেড অয়েল রিফাইনারীর কেন্দ্রীয় অফিস সেই গ্রামে। তৈল শহরের ঠিক বাইরে রুট নম্বর ৬২ ধরে পশ্চিমমুখে এগোলে কয়েক বছর আগেও একটা সাইনবোর্ড দেখা যেতো, তাতে লেখা :

ফ্রাংকলিন ৮

রেনো ৩

প্রায় বছর তিরিশেক আগে কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী সম্ভবত এটাকে তার ছদ্মনাম হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আর যে কারণে এতো প্রচুর সংখ্যক গবেষক ব্যাপারটার ঠিক হদিশ করে উঠতে পারে নি।

এবারে প্রশ্ন, ফ্রাংকলিন রেনো যদি ছদ্মনাম হয়ে থাকে, তবে এই ছদ্মনামের আড়ালে কে সেই বিজ্ঞানী? তার সঙ্গে কার্লস. মিগুয়েল এলেণ্ডের যোগসূত্রটাই বা কী? আর রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে সে কতখানি সাহায্যে আসতে পারে?

অবশ্য এই ব্যাপারটাও এতো জটিল যে পরিপূর্ণ উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় কারণ এলেণ্ডে যে ডক্টর রেনোর কথা চিঠিতে লিখেছে সেই ডক্টর রেনো মারা গেলেও সেই নামের দাবীদারের সংখ্যা ইতিমধ্যে কম দাঁড়ায় নি। সুতরাং এখন থেকে তাকে আমরা ডক্টর রাইনহার্ট নামেই সম্বোধন করবো। ডক্টর রাইনহার্ট সম্পর্কে বলা যায় ডক্টর মরিস জেসুপের জন্মের কয়েক বছরের

মধ্যেই ডক্টর রাইনহার্টের জন্ম। তবে দেশের অন্য অংশে। পি এইচ্ ডি ডিগ্রী নিয়ে বেসরকারী কয়েকটা রিসার্চ ইনষ্টিটিয়ুটে কৃতিত্বের সঙ্গে চাকরী করার পর আমেরিকাতে আসে অর্থনৈতিক হতাশার বছর। অনেকের মতে ১৯৩০ সালে রুটি জোগাড়ের তাগিদাতে আমেরিকার মিলিটারী সাইন্টিফিক গবেষণায় চাকরী নিতে বাধ্য হয় ডক্টর রাইনহার্ট। ডক্টর জেস্পেরও এই সময় একই অবস্থা হয়েছিল। পরবর্তী দশকে একটা ডিফেন্স রিসার্চ সেণ্টারের মুলপদে কাজ করেছে ডক্টর রাইনহার্ট। এবং দেখেশুনে মনে হয় ফিলাডেলফিয়া প্রজেক্টের গোড়া থেকেই ডক্টর রাইনহার্ট এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

সেই ব্যক্তিত্বকে খুঁজে বার করা সহজ হলেও বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার মুখ খোলানো সহজ ব্যাপার হয় না। বিশেষ করে গত পঁচিশ বছর ধরে যে নিজেকে তার সহকর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য এক জগতে বাস করছে।

আসলে ডক্টর রানইহার্ট যখন উপলব্ধি করে যে ব্যাপারটা সম্পর্কে ও এতো বেশী জানে যা সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক তখনই সে নিজেকে সমাজের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাই ভবিষ্যতে উজ্জ্বল এক বৈজ্ঞানিক জীবনের লোভের হাতছানি উপেক্ষা করে পাহাড়ের খাঁজে ছোট্ট ছবির মতো ঝকঝকে একটা বাংলোর মধ্যে প্রায় নির্বাসিত এক সাধুর জীবন যাপন করতে শুরু করে। তবে মাঝে মধ্যে পুরানো সহকর্মী বা বন্ধুদের জন্য নিদেন গৃহস্থালীর টুকিটাকি কেনার জন্য শহরে নেমে আসতো।

রাইনহার্ট আর মুরের মধ্যে প্রায় একবছর চিঠি চালাচালির পরে রাইনহার্ট মুরের সঙ্গে ব্যক্তিগত দেখাসাক্ষাতে রাজী হয়। মুরের নিজের ভাষায়ঃ

তপ্ত জুলাই মাসের অপরাহ্ন। গাড়ীটা বেশ কিছু দূরে পার্ক করে হেঁটেই এগিয়ে চলি, বাংলোর দিকে। যাতে মিছিমিছি অন্য কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ না করি সেদিকে যথেষ্ট নজর রেখেছিলাম। মনে মনে তখনো আশংকা যে আমার এই আসা বিফলে যাব;

বাদামী রঙের গাছপালায় লনটা অগোছাল; দেখেই বোঝা যায় অনেক দিন ছাঁটা হয় নি। জায়গাটা একনজরে দেখলে পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়। আমার অবাক লাগে, এই প্রচণ্ড গরমে এতো আবদ্ধ বাড়ীতে কি কখনো কেউ বাস করতে পারে?

পোর্চে পা রাখতে ডোরা কাটা আলসে একটা বেড়াল রেলিংয়ে শুয়ে শুয়ে আমার দিকে চোখের পাতা খুলে তাকায়। বেড়ালটার সেই দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ অবজ্ঞা ছড়ানো। আমাকে দেখেও এতটুকু নড়েচড়ে বসে না। দরজায় আল্‌তো শব্দ করতে কোথাও কিছু একটা বেজে ওঠে। পর্দাটা একটু ফাঁক করে চশমায় ঢাকা খরগোসের মতো একজোড়া চোখ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। কয়েকটা মুহূর্তের বিরতি; তারপরেই দরজাটা খুলে যায়। সামনে প্রায় ন্যুব্জ, সাদা চুল কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি নিয়ে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। দেখেই বোঝা যায় জোর করে মুখে টেনে এনেছে হাসির টুক্‌রোটা। —হ্যালো। ওর অপ্রস্তুত হাবভাবের সুযোগ নিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলি,—আজ সকালে টেলিফোনে আপনার সঙ্গে আমি-ই কথা বলেছিলাম। —হ্যাঁ। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। —ভেতরে আসুন, ধীর কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ় ভাবেই কথাগুলো ভদ্রলোক উচ্চারণ করে।

বাড়ীটা ছোট হলেও সুখপ্রদ। ভেতরে ঠাণ্ডা। বাইরের গরম থেকে ঢুকে আরামই লাগে। বসবার ঘরে পুরনো একটা অ্যালুমুনি-য়ামের পাখা; ধীরে ধীরে ঘুরে বাতাস কাটছে। তাছাড়া ঘরটা নিস্তব্ধ।

কোণের দিকে একটা চামড়া মোড়া পুরনো সোফা দেখিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে, বসুন। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে সোফায় বসে পড়ি। তারপর বলি,—পৃথিবীটাকে সরিয়ে দিয়ে ছোট্ট কিন্তু আরামপ্রদ বাড়ীটা যে খুঁজে পেয়েছেন, তাতে আমি আনন্দিত। মনে হয় না এখানে খুব বেশী সংখ্যায় অতিথি এসে আপনাকে বিরক্ত করে।

—যদি অতিথি-ই চাইব, তবে আর এখানে থাকবো কেন বলুন?

কথা কটা শেষ করে একটু বাঁকা চোখে তাকায় ভদ্রলোক আমার দিকে।

তারপর আবার আগের প্রসঙ্গ জুড়ে নিয়ে বলে, আসলে সবদিক বিবেচনা করলে আমি এখানে বেশ সুখেই থাকি। আমাকেও যেমন কেউ বিরক্ত করে না, তেমনি আমিও কাউকে বিরক্ত করি না। ব্যাপারটাকে আমি এই ভাবেই চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

ধীরে ধীরে ডক্টর রাইনহার্ট কিন্তু প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

– জানেন, এখানে ওরা আমার ওপর নজর রেখে চলেছে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে শহরের কয়েকটা জায়গায় আমি মোটেই যাই না। কারণ আমার উপস্থিতি সেখানে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে নীচের ইউনিভারসিটির কয়েকটা বাড়ীতে আগে মাঝে মধ্যে আমি যেতাম। কিন্তু দেখি আমি গেলেই নিরাপত্তা বাহিনী সজাগ হয়ে ওঠে; তাই ছেড়ে দিয়েছি। আমি ভ্রমণের জন্য টিকিট কিনতে গেলেই দেখেছি সাড়া পড়ে যায়। নাম বললেই নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের মধ্যে সাজ সাজ রব। আমার নিজেরই এটা অলস কল্পনা মনে করে একবার পরীক্ষা করে দেখেছি। না কল্পনা নয়। আমার চিন্তাই ঠিক। যাইহোক, আপনি তো এতো কষ্ট করে এসেছেন সেই জাহাজী একস্‌পেরিমেন্টের বিষয়ে আমার মতামত শুনতে, তাই না? জানেন, আপনি যখন প্রথমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তারপরে বিষয়টাকে নিয়ে আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। বর্তমানে আমি বৃদ্ধ, আর ঘটনাটাও অনেকদিন আগে ঘটে গেছে। তাই যদিও স্মৃতিতে ধূসর তবু যদি আপনার শোনার মত ধৈর্য থাকে, কয়েকটা বেড়াল হয়তো বা থলি থেকে বেরোলেও বেরোতে পারে। তবে আপনি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার পরিচয় গোপন রাখবেন। সেটা ভুললে কিন্তু চলবে না। সবচেয়ে দরকারী হলো আমার পরিচয় গোপন রাখা। সত্যি করে বলতে গেলে, আমার বর্তমান জীবনধারার এটাই হলো চাবিকাঠি।

— প্রতিজ্ঞাটা কিন্তু আমার স্মরণে আছে। জোর করে এক টুকরো

হাসি টেনে বলি। আর সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ভালো একজন শ্রোতা বলেই মনে করি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। যেন শেষ সন্দেহের মেঘের টুক্‌রোটাকে সরিয়ে দিতে চায়। তারপর চেয়ারটাকে পেছনদিকে একটু ঠেলে দেয়; সুরু হয় আশ্চার্যজনক রহস্যময় কাহিনী। বলাবাহুল্য, জীবনে এই ধরনের কাহিনী আমি আর শুনি নি।

—আপনি বোধহয় জানেন যে, যে কোন একস্‌পেরিমেণ্টের সুরু-ই হয় প্রচ্ছন্ন একটা ধারণা থেকে। সেই ধারণা বা চিন্তাভাবনা রূপ নেয় অংকে বা কিছু হিসেব নিকেশে। তারপরে আসে প্রজেক্ট অধ্যায়। একেবারে শেষে হচ্ছে একস্‌পেরিমেণ্ট বা কতকগুলো একস্‌পেরিমেণ্ট। তবে এই অবস্থায় খুব বেশী সংখ্যক লোক কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে যুক্ত থাকে না।

কয়েক মুহূর্তের বিরতি; হয়তো বা ভদ্রলোক মনের ভেতরের পরতে পরতে ব্যাপারটাকে ঠিক কিভাবে বলবে তা' সাজিয়ে গুছিয়ে নয়।

আবার যখন বলতে শুরু করে, প্রতিটি শব্দ আরো সতর্কতার সঙ্গে বেছে ধীর-সুস্থির গলাতে বলে—হ্যা ইউনিফাইড ফিল্‌ড থিয়োরী তার পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় নি। হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত। কেউ দাবী করতে পারবে না যে থিয়োরীটাকে সে সম্পূর্ণ রি-চেক করতে পারছে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে থিয়োরীটার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তা'তে অনেকের চিন্তাভাবনার ইট গেঁথেছে। জার্মান টাইটেল হলো: আইনহাইট্‌লিসে—ফেলড—থিয়োরী। তবে যে অর্থে স্পেশাল থিয়োরী অফ্‌ রিলেটিভিটি সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই অর্থে ইউনিফাইড ফিল্‌ড থিয়োরী সম্পূর্ণ হয়নি। অবশ্য তত্ত্বটার যে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি হয়েছে; সেই সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে এগুলো আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আবার ভদ্রলোক থামে। এবং তারপরেই বিস্ফোরণ। —জানেন, ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। পরিশ্রমও কম করিনি। এবং তার ভিত্তিতেই

বলতে পারি পুরো একটা জাহাজকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালানোর মতো যথেষ্ট পরিমাণে মাল মশলা তা'তে রয়েছে।

—যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকটা কনফারেন্স হয়েছিল যাতে নেভেল অফিসাররা অংশ নিয়েছিল। বিশেষ করে আপনি যে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছেন, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ১৯৪৩ সালের আগে। সম্ভবত ১৯৩৯ বা ১৯৪০ সালে হবে। যখন আইনষ্টাইনের কাছে কয়েকজন পদার্থবিদ থিয়োরীটাকে সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য আবেদন করে।

অনেকগুলো ঘটনা যোগ করলে মনে হয় প্রস্তাবটা করা হয়েছিল আইনষ্টাইন এবং রুডল ফ লাভেনবার্গকে। তবে কার নাম প্রথমে করা উচিত তা আমি বলতে পারবো না। অবশ্য এদের পেছনে যদি আর কেউ থেকে থাকে তবে তা' আমি জানি না। অবশ্য এটা জানি যে প্রফেসর লাভেনবার্গ সুইজারল্যাণ্ড থেকেই আইনষ্টাইনকে চিনতো। চাপা খুঁতখুঁতে টিপিক্যাল প্রাচীন রাশিয়ান, সম্ভ্রান্ততার ছাপ তার চালচলন এবং আচার-আচরণে। সহকর্মীরাও ওকে একক চিন্তানায়ক ও কর্মী হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো।

রাইনহার্ট এই পর্যন্ত বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকবার পায়চারি করে। জানালার সার্সি দিয়ে বাইরেটা ভালো করে দেখে। তারপর যখন স্থির নিশ্চিত হয় যে আমাদের কেউ আর বিরক্ত করবে না, তখন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে :

লাভেনবার্গ সম্পর্কে বলা যায় মাইন্স ও টর্পেডো এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল ভদ্রলোক। বিশেষ করে একটা কনফারেন্স বা কালোকুইমের কথা আমার মনে আছে, যাতে জার্মান অস্ত্রশস্ত্রের অগ্রগতির প্রসঙ্গ ওঠে। আমি যে পদার্থবিদ ডক্টর ডবলু ডবলু আলব্রাগটের অধীনে কাজ করতাম, সেই ডক্টর আলব্রাগট কিছুক্ষণ পরেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। কারণ আলোচনায় এমন কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছিল না, যা নতুন। অবশ্য এখানে বলা প্রয়োজন ডক্টর ডবলু ডবলু আলব্রাগট কিন্তু ছদ্মনাম।

যাইহোক, ডক্টর আলব্রাগট দাঁড়িয়ে উঠে বলে, এই কনফারেন্সে উপস্থিত ডক্টর লেভেনবার্গ-ই একমাত্র ব্যক্তি, যার জার্মান সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। মহাযুদ্ধে একমাত্র লেভেনবার্গই জার্মান সাবমেরিন কমাণ্ডার বা সেই রকম উঁচুপদে কাজ করেছে। আমার কিন্তু মনে হয়, ডক্টর আলব্রাগটের এই কথাগুলোর মধ্যে সত্যতা কিছু ছিল না। স্রেফ ডক্টর লাভেনবার্গকে কিছুটা উত্তেজিত করে দেওয়া ছাড়া। অবশ্য আমার কোন ধারণা নেই যে ডক্টর লাভেনবার্গ কোনদিন জার্মান সাবমেরিন কমাণ্ডার হিসেবে আদৌ কাজ করেছে কিনা। তবে যাই হোক না কেন ডক্টর আলব্রাগটের কৌশলটা কিন্তু কাজে লাগে। ঠিক সেই মুহূর্তে লাভেনবার্গ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করে জার্মানরা কি করছে বা অদূর ভবিষ্যতে কি করতে পারে। সুতরাং কনফারেন্স আবার তার উদ্দেশ্যের পথ ধরেই চলতে থাকে। কেউ কেউ আবার বলছিল যে লাভেনবার্গ নাকি সবেমাত্র জার্মানদের সদর ঘাঁটির অফিস ছেড়ে চলে এসে মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

রাইনহার্ট মনে মনে নিজেকে যেন আরো কিছুটা সামলে নেয়। সংযত হয়ে কথার রাশ টেনে ধরে :—

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্ম এবং বসন্ত কাল ধরে লাভেনবার্গ প্রিন্‌সটন ফিজিক্স ল্যাবরেটারীতে ফিসন একসপেরিমেণ্টের ওপর কাজ করছিল, কোথায় যেন পড়েছে, ঠিক এই মুহূর্তে স্মরণে আনতে পারছি না। আইনষ্টাইনের সঙ্গেও তার এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সেই সময়েই হয়েছিল। যাইহোক, ১৯৪০ সাল থেকে প্রজেক্টের প্রস্তাবরূপের সময় থেকে আমি যুক্ত ছিলাম, তা' হলো আইনস্টাইন এবং লাভেনবার্গের আলোচনার ফল। ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটকে মাইন্‌স এবং টর্পেডো আক্রমণের প্রতিহত করার ব্যাপারে ব্যবহার করা নিয়ে। সেই প্রস্তাবের লেখক ছিল স্বয়ং আইনষ্টাইন।

প্রজেক্ট 'প্রস্তাবটাকে অগ্রগামীর রূপ দিয়েছিল অবশ্য আইনস্টাইন এবং লাভেনবার্গ। তবে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই

তারা ছিল আগ্রহী। ডক্টর জোহান ভন নয়িম্যান সংখ্যাতত্ত্ব এবং অংকের ব্যাপারে ছিল বিশেষজ্ঞ। ডক্টর নয়িম্যানের সঙ্গে নেভী যোগাযোগ করেছিল আগামী কোন কুয়াসাচ্ছন্ন দিনের ব্যাপারে।

যাইহোক ডক্টর নয়িম্যানই প্রস্তাবটা নিয়ে ডক্টর আলট্রাস্টের সঙ্গে আলোচনা করে। এবং নেভেল রিসার্চ ল্যাবরেটারী যে ভবিষ্যতে এই প্রজেক্টের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিল, তার ব্যবস্থা সম্ভবত এরাই করে দিয়েছিল। অবশ্য প্রস্তাবটা বিখ্যাত পদার্থবিদ রবার্ট হ্যারিংটন কেণ্টের চিন্তাধারাকে কিছুটা যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। কারণ কেণ্ট-ই সলিনাইড ক্রোনোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করেছিল। আর সলিনাইড ক্রোনোগ্রাফির মূল তত্ত্ব যদি জানা থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানেন যে এই তত্ত্বেই বলা হয়েছিল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ক্ষেপনাস্ত্রের আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে লাগানো যেতে পারে।

রাইনহার্টের ধারণা সলিনাইড ক্রোনোগ্রাফি ব্যাপারটা আমি বুঝি। আসলে আমি কিন্তু শব্দ দু'টো জীবনে এই প্রথম শুনলাম। তবু জানার ভান করি যাতে রাইনহার্টের কথার স্রোতে বাধা না পড়ে।

রাইনহার্ট বলে—আমার যতোদূর জানা আছে তা'তে বলতে পারি কেণ্টহলো সলিনাইড ক্রোনোগ্রাফির আবিস্কারক। তা' যদি নাও হয়, তবে সে-ই যন্ত্রটার যে উন্নতি করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেণ্ট-ই ড্রাগ কো-এ্যাফিসিয়েন্ট ফর প্রজেক্টাইল হাই ম্যাচ নাম্বারের ক্ষেত্রে এর প্রথম প্রয়োগ করে। তত্ত্বটার মূল সূত্র প্রদর্শনের জন্য কেণ্ট চৌম্বকশক্তি সম্পন্ন লোহার স্লাগকে সলিনাইডের ভেতরে ফেলে দিয়ে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তার নাম হলো ওসিলোস্কোপ। সলিনাইডটা আবার লোহার স্লাগের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করলেও একই ফলাফল ধরা পড়ে। সুতরাং প্রমাণিত হয় ল' অফ ফিজিকস্ একই। যেখানে অন্তর্নিহিত কো-অরডিনেট্ ধারা কাজ করে। অবশ্য ব্যাপারটা আইনস্টাইনের

১৯০৪ সালে প্রকাশিত স্পেশাল রিলেটিভিটি বা বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ববাদকে মেনেই চলে।

সেইদিনগুলোর একটা প্রচলিত গুজব আমার মনে আছে ভন নয়িমানের এই ধরনের প্রজেক্টের উৎসাহের কথা শুনে কেণ্ট বহুদিন আগে কয়েকটা কাগজ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। আমার এক বন্ধু যে নাকি কেণ্টের দপ্তরে কাজ করতো তার কাছ থেকেই শুনেছিলাম ব্যাপারটা। কেণ্টের দপ্তর তখন মেরীল্যাণ্ডে বেশ কয়েকবার ওর দপ্তরকে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুতরাং চাওয়া কাগজ হাতের কাছে খুঁজে পাওয়াও সহজ কথা নয়। ব্যাপারটায় কেণ্ট এতো রেগে যায় যে দপ্তরের সবাই সেই কাগজ খোঁজার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সবকিছু নামিয়ে-টামিয়ে স্তূপাকার করা হয় মেঝেতে। দপ্তরের তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। যাইহোক, অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ঝুরঝুরে দু'খানা বাদামী রঙের কাগজ একটা ফাইলের মধ্যে থেকে পাওয়া যায়। অবশেষে কাগজদু'টো বিজয়ীর ভঙ্গীতে কেণ্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

কাগজদু'টো সঙ্গে নিয়ে কেণ্ট এবারে একদল পদার্থবিদ এবং ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করতে যায়। এদের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই কেণ্ট চিনতো। তবে মনে হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বা ঠিক পরে এদের সঙ্গে একসাথে কেণ্ট কাজও করেছে। তাদের মধ্যেই একজন হলো প্রফেসার চার্লস এম অ্যালেন।

অ্যালেন? আমি চমকে উঠি। কার্ল এম অ্যালেনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো?

আমার প্রশ্ন শুনে রাইনহার্ট হেসে উঠে বলে, না, না আমি তা' মনে করি না। কার্ল অ্যালেন নয়, তার নাম হলো চার্লস অ্যালেন। পুরো নাম হলো চার্লস মেটকাফ অ্যালেন যতদুর আমার স্মরণে আসে। সেই সময়ে চার্লস অ্যালেন হাইড্রোলিক ইঞ্জীনিয়ারিং বিষয়ের অধ্যাপক। ওরেসেস্টার

পলিটেকনিকের। চার্লস অ্যালেনের জাহাজ, মাইনস ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান থাকায় হয়তো বা চার্লস ওকেই বেছে নিয়েছিল আলোচনার জন্য। তবে আগে আমি কখনো চিন্তা করিনি চার্লস অ্যালেন আর কার্ল অ্যালেনকে নিয়ে। মনে হয় এক ব্যক্তি নয়। কারণ প্রফেসার অ্যালেন তখনই বৃদ্ধ এবং প্রখ্যাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন সুরু হয়েছে চার্লস অ্যালেনের বয়েস তখন হবে সত্তরের কাছাকাছি।

এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে যে একস্পেরিণ্টের প্রয়োজনে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ডও তৈরী করার ব্যাপারে কেণ্টের পরামর্শ ছিল রিসোলেনস্ তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া। হয়তো বা কেণ্ট এই ব্যাপারে অ্যালেনের সঙ্গে পরামর্শ করেই ঠিক করেছিল। এরপরেই সত্যিকারের জাহাজের পরিবর্তে মডেল জাহাজের ওপরে একটা একস্পেরিমেণ্ট চালানো হয়। আমার দৃঢ় ধারণা অ্যালেন আর কেণ্টের আলোচনার পরেই নেভী ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড রকমের উৎসাহী হয়ে পড়ে। আর রাডারকে নিষ্ক্রিয় করার কথাটা ওঠে আরো অনেক পরে। কয়েকটা কনফারেন্সে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনাও করা হয়েছিল।

যাইহোক, আগের কথায় ফিরে আসা যাক। ভন নয়িম্যান এই ধরনের প্রজেক্টের প্রস্তাব করেছিল ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে অথবা ১৯৪০ সালের গোড়ায়। ন্যাশানাল ডিফেন্স্ রিসার্চ কমিটি অর্থাৎ সংক্ষেপে এন ডি আর সি'র কাছে। আর প্রফেসার কেণ্ট এন ডি আর সি'র ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রজেক্টটাকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে।

এবারে আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, বলতে পারেন ওদের দু'জনের এই প্রজেক্টের ব্যাপারে এত উৎসাহের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে?

রাইনহার্ট বলে,—এর উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। প্রথম থেকেই এটা ছিল আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা। আক্রমণ করার নয়। মনে হয় প্রথমে ধারণা ছিল শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রের সাহায্যে

ক্ষেপণাস্ত্রকে বিপথগামী করে দেওয়া। বিশেষ করে জাহাজের চারিদিকে যদি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরী করা সম্ভব হয়, তবে হয়তো বা টর্পেডোকে অকেজো করে দেওয়া যাবে। পরে এই চিন্তাটাকেই আরো প্রসারিত করা হয়। এই ধরনের চৌম্বকক্ষেত্র জলে নয়, বাতাসে তৈরী করে সম্পূর্ণ জাহাজটাকেই দৃষ্টির বাইরে রাখা।

একদিন, সম্ভবত সেই দিনটা হবে ১৯৪০ সালের প্রথমদিকের। সকাল আটটা নাগাদ ডক্টর আলব্রাখ্‌ট অফিসে এসে হাজির হয়। এন ডি আর সি থেকে দুই অথবা তিনজন অতিথি তখন ডক্টর আলব্রাখ্‌টের অফিসে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। ব্যাপারটায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। কারণ প্রায়ই এন ডি আর সি' থেকে লোকজন ডক্টর আলব্রাখ্‌টের সঙ্গে দেখা করতে অফিসে আসতো। কিন্তু সাড়ে ন'টার সময় ক্যাপ্টেন গিবনস্ আড়ালে আমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চায়। আমি তখন কয়েকটা তাত্ত্বিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত এবং কমপিউটরের সঙ্গে টেলিফোনে সেই বিষয়েই কথা বলছিলাম। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তখন ইলেক্‌ট্রোনিক কমপিউটার আবিষ্কার হয় নি। গবেষণায় যে লোকটা সত্বর আংকিক দিকটার সমাধানে সক্ষম, তাকে কমপিউটার বলা হ'তো।

বুঝতে পারি ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুতর। তাই কাজ ছেড়ে উঠে আমি ঘরের বাইরে আসি। গিবনসের সঙ্গে আলব্রাখ্‌টের অফিসে এসে দেখি আগে থেকেই কোন একটা বিষয়ে আলোচনা চলছে। একদিকে এন ডি আর সি-র দুই অথবা তিন জন, অপর দিকে আলব্রাখ্‌ট এবং ভন নয়িম্যান। ভন নয়িম্যান কিন্তু বেশীক্ষণ সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই উঠে চলে যায়। মনে হয় ভন নয়িম্যানের দায়িত্ব ছিল শুধু এন ডি আর সি'র লোকদের সঙ্গে ডক্টর আলব্রাখ্‌টের পরিচয় করে দেওয়া। বড়জোর হ'তে পারে যে বিষয়ে কথাবার্তা হবে, সেই বিষয় বস্তু সম্পর্কে উভয়পক্ষকে বুঝিয়ে বলা।

ভন নয়িম্যান সামরিক সংবাদ আদান প্রদানে প্রায় সব সময়েই ব্যস্ত থাকতো। এই ব্যাপারে ওকে নিয়মিত ওয়াশিংটনে যাতায়াত করতে হ'তো এন ডি আর সি-র অফিসে বিভিন্ন সামরিক প্রজেক্টের ব্যাপারে। তাই মনে হয় এই প্রজেক্টের ব্যাপারে ভন নয়িম্যানের উৎসাহ না থাকলেও এটা ওর নিয়মিত কাজের মধ্যেই পড়েছিল। তবে যে ধরনের কাজ নয়িম্যান করতো, তাতে যে ব্যাপারে ওর উৎসাহ তাকে তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা নয়িম্যানের ছিল। হয়তো বা ওর সেই উৎসাহজনক প্রজেক্টগুলোর মধ্যে এটাও পড়ে। যাই হোক, আমি হাজির হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে ডক্টর ভন নয়িম্যান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

রাইনহার্ট আবার চেয়ার ছেড়ে ওঠে। জানালা দিয়ে বাইরেটা ভালো করে দেখে নিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে।

আমি যখন আলোচনার মধ্যে আসি, তখন আপনি যে প্রজেক্ট সম্পর্কে উৎসাহী সেটার বিষয়ে আলোচনাটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছে। আলব্রাখ্‌টের চরিত্রের একটা দিক ছিল যে আলোচনা ছেড়ে সে কখনই উঠত না। কোন অংকের হিসেবের প্রয়োজন পড়লে আর কাউকে পাঠাতো। মাধ্যাকর্ষণ এবং আপেক্ষিকবাদ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে মনে করেই আমাকে সেই আলোচনার সময় আলব্রাখ্‌ট ডেকে পাঠিয়েছিল। যাতে এই বিষয়ের হিসেবের অংকগুলো আমার দ্বারা হাতের কাছেই পেতে পারে। আর একটা কারণ হলো, আলব্রাখ্‌ট জানতো যে কোন বিষয়েই বেশী প্রশ্ন করার স্বভাব আমার নেই।

আলব্রাখ্‌টের কাছে দু'তিনটে কাগজের পাতা দেখেছিলাম। তারমধ্যে একটাতে ছোট ছোট আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় ভর্তি। একমাত্র ডক্টর আইনষ্টাইনের হাতের লেখাই সেই ধরনের। ও যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত, তখন আমাকে কাগজগুলো দেখতে বলে। আর লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমাকে কি করতে হবে, সেই বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে চলে। একটা কাগজে মনে আছে

রেডিয়েসান ওয়েব ইক্যুয়েসান ছিল। আর বাঁ দিকের কাগজটায় অসম্পূর্ণ কিছু কাটা। এই কাগজগুলোকে ভিত্তি করেই নেভেল ডিগাউসিঙ্ ইক্যুপমেণ্টের ওপরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলো, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কাগজটার এখানে ওখানে হাত রাখছিল। আলব্রাখ্ট যেখানে যেখানে হাত রাখছিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় পেন্সিলের দাগ দিচ্ছিলাম। এর পরেই আলব্রাখ্ট বলে ওঠে,—আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আলোর গতি বাঁকিয়ে দেওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন। প্রায় দশমাংশ করতে পারলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তারজন্য কি ছোট তালিকা একটা কি দু'টো করে দেবো ?

এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করি,—আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে ?

আলব্রাখ্ট উত্তর দেয়,—না, খুব বেশীক্ষণ নয়। এরপরেই আলব্রখ্ট অন্যদের দিকে তাকায়, কিন্তু তখন ওরা পরস্পর কথা বলায় মত্ত। সুতরাং আলব্রাখ্টের চিন্তার স্রোতটাও হারিয়ে যায়।

আমার মনে হয় এই সময়ে রিসোনেন্সের তত্ত্বের থেকে ইন-টেনস ফিল্ড চিন্তাভাবনাটা আসে। অবশ্য রিসোনেন্সের তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে ইনটেনস ফিল্ডে পৌঁছানো সম্ভব। আমি কিছুক্ষণ সেই ভাবেই বসে থাকি। পরে আলব্রাখ্ট মাথা নেড়ে আমাকে ঘর ছেড়ে গিয়ে কাজটা শেষ করে নিয়ে আসতে বলে। আমি ক্যাপ্টেন গিবন্সকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে আলব্রাখ্টের এটা কখন দরকার ; একটু চিন্তা করে নিয়ে গিবন্স বলে,—আমি অফিসার্স ক্লাবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। সুতরাং লাঞ্চের সময় তুমি শেষ করে ফেলতে পার। তবে তার বেশী সময় দেওয়া সম্ভব নয়। বড় জোর দুপুর দু'টো পর্যন্ত সময় দেওয়া যেতে পারে।

ডক্টর আলব্রাখ্টের দেওয়া নোট বুঝে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। আমার মতো অংক এবং তত্ত্বের ওপর দখল না থাকলে কারোর পক্ষে আলব্রাখ্টের নোট নিয়ে এগোন অসম্ভব। একথা ঠিক যে ডিপার্টমেণ্টে আরো যোগ্য লোক ছিল, তবে তাদের সময়ের

দরকার। আর আলব্রাখ্‌টের ঠিক তক্ষুনি প্রয়োজন। সুতরাং আমার ওপরেই দায়িত্বটা বর্তেছিল।

অফিসার্স ক্লাবের লাঞ্চ নিশ্চয়ই সেদিন কুইক লাঞ্চ হয়েছিল। কারণ একটা পনেরো নাগাদ গিবন্‌স এসে হাজির হয়। আমি তখনো হিসেব-নিকেশ করছি সুতরাং গিবন্‌সকে বলি কাজটা শেষ করে টাইপ করা একটা মেমো তৈরী করতে করতে তিনটে বেজে যাবে। গিবন্‌স সঙ্গে সঙ্গে বলে—না, না। টাইপ করা কিছু হবে না। সবকিছু পেনসিলে করতে হবে। আর এটার মেমো-টেমো তো রাখা চলবেই না।

—অবাক ব্যাপার! সব সময়ই এরা অবাক করা কাণ্ড করে; যাইহোক, তাহলে আরো কুড়ি পঁচিশ মিনিটের দরকার।

কথাটা শুনে গিবন্‌স খুশী না হলেও উপায় তো নেই। রেজাল্ট নিতে হলে অপেক্ষা করতেই হবে। সুতরাং আমি কাজটা শেষ করার ব্যাপারে আরো কুড়ি মিনিট সময় পাই।

শেষ পর্যন্ত ছোট কয়েকটা তালিকা প্রস্তুত করি, এবং শেষে কয়েক লাইনের একটা প্যানেলও জুড়ে দিই। সমস্ত ব্যাপারটাই পেনসিলে লেখা একটা মেমের রূপ নেয়। তারপর আমি আর গিবন্‌স সেটা নিয়ে যাই আলব্রাখ্‌টের কাছে। পেনসিলের মেমোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আলব্রাখ্‌ট বলে, -তুমি তো দেখছি জাহাজের থেকে বিভিন্ন দূরত্বের ঘনত্ব কষেছো। কিন্তু তার আগের বা পরের কিছুই তো দেখছি না।

আলব্রাখ্‌ট সব সময়েই বিস্তারিত কিছু করার ব্যাপারে কুঁড়ে ছিল। আমি ওসব কষি নি কারণ কি করে জানবো ওগুলোরও দরকার। আর আলব্রাখ্‌ট ঠিক কি চায় তাও জানি না। সময়ও তো কম। এতো কম সময়ে এতো বিস্তারিত করাও সম্ভব নয়। আমার করার মধ্যে ছিল ইকুয়্যপমেণ্টের বিপরীত দিকে জাহাজের রশ্মির সবচেয়ে দীর্ঘ বক্ররেখার কেন্দ্রবিন্দুটা বার করা। আইন-ষ্টাইনের নোট কিন্তু আলব্রাখ্‌টের থেকে অনেক পরিষ্কার ও বিস্তারিত। কিন্তু আমি সেকথা আলব্রাখ্‌টকে বলি কোন সাহসে!

রাইনহার্ট বলে,—এখন আমার মনে হয়, সেদিন ভন নয়িম্যানও অফিসে উপস্থিত ছিল। এবং কাগজ পত্র নিয়ে এসেছিল সম্ভবত নয়িম্যানের সহকারী অস্‌ভাল্ড ভেব্‌লন। বোধহয় এন ডি আর সি'র লোকেরাও তার সঙ্গেই এসেছিল। আলব্রাখ্‌ট চেয়েছিল ফিলডের কতোখানি শক্তিশালী, আর জাহাজ থেকে বেরিয়ে আসা আলোব রশ্মিগুলোকে এতোদূব পর্যন্ত বাঁকানো যায় কিনা, যাতে মরীচিকার সৃষ্টি করা যেতে পারে। ঈশ্বরই জানেন, ওদের ধারণা ছিল কিনা যে শেষপর্যন্ত ফলাফল কি হ'তে পাবে। তবে আমার মনে হয়, যদি ওরা তা'.জানতো, তাহলে ব্যাপারটার ওখানেই পবিসমাপ্তি ঘটতো। তাই মনে হয় ওদের বিষয়টাতে কোন ধারণাই ছিল না।

আমার অবশ্য নিজেব মত যে এই ব্যাপারে এন আর ডি সি এবং লেভেনবার্গ অথবা ভন নয়িম্যানই ছিল নায়ক। ওরা আইনষ্টাইনের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলে, আইনষ্টাইন রাজীও হয় এবং শেষে হয়তো বা আইনষ্টাইন ভন নয়িম্যানকে বলে বাস্তব ব্যাপারে এর প্রয়োজনটাকে আরো পরীক্ষা-নীরিক্ষ .করে দেখতে। তবে কবে থেকে নেভেল রিসাচ ল্যাব্‌ বিষয়টাব ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল তা' ঠিক বলতে পারি না। অবশ্য নেভীব বিজ্ঞানীদেব ওপবের সারির বিজ্ঞানী কমাণ্ডাব পাবসনস প্রায়ই আলব্রাখ্‌টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবতে আসতো। সেই আলোচনার সময়েই বোধহয় জাহাজের কথাও ওঠে।

আমার কাজ কিন্তু তেমন কিছু ছিল না। শুধু আলব্রাখ্‌টের ইক্যুয়েসান্‌গুলোকে ক্রমানুপাতে সাজানো আর কয়েকটা টেবিল বা তালিকা প্রস্তুত করা। স্মরণে আছে ওর পরের কয়েকটা কনফারেন্সে আমার সাজানো ইক্যুসানগুলোর বিস্তাব করা হয়েছিল। সুতরাং অপরপক্ষে কি করছে ওগুলোকে নিয়ে সেই সম্পর্কেও কিছুটা সচেতন ছিলাম বৈকি। তবে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করি,—প্রজেক্টটার কি কোন কোড নাম দেওয়া হয়েছিল? আপনি মনে কবতে পারেন?

চুপ করে রাইনহার্ট কয়েক মুহূর্ত ভাবে. তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলে,—আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে পুরো ব্যাপারটাকেই আলব্রাখ্‌ট এবং গিবন্‌স অত্যন্ত গোপনে রেখেছিল। এমন কি যার জন্য বিষয়টার ওপরে লেখা টেখা সবই পেন্‌সিলে করেছিল, যাতে কোন কপি না থাকে। টাইপ করা হয় নি, যাতে কোন কার্বন কপি না থাকে। একবার যে রেফারেন্স করা হয়েছিল তা আমার বেশ মনে আছে; তাতে লেখা ছিল ডিফ্রেকসান্‌ বা প্রতিফলন। একটা কনফারেন্সে আমি একথাও বলেছিলাম যে এর থেকেও জাহাজ অদৃশ্য করার অনেক সহজ উপায় হলো হালকা বাতাসের কোন আস্তরণে জাহাজটিকে ঢেকে দেওয়া। তারজন্য এতো খটমটে একটা তত্ত্বের পেছনে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমার কথাটা শুনে আলব্রাখ্‌ট চশমাটা চোখের থেকে খুলে টেবিলের ওপর রাখে, তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে,—আলোচনার গতিপথ থেকে মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার আশ্চর্য দক্ষতা দেখছি তোমার মধ্যে রয়েছে।

প্রজেক্টটার কোড নাম রাখার দায়িত্ব ছিল এন ডি আর সি'র ওপরে। এবং যতোদূর মনে পড়ে অন্তত এই পর্যন্ত প্রজেক্টার কোন কোড নাম ঠিক করা হয় নি। পরেও এটার কোন কোড নাম দেওয়া হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে সেই সময়েই আমার মনে হয় 'রেন-বো' বা 'মিরেজ' নাম দিলে ঠিক হবে। স্মৃতি তো বিস্মৃতিরই নামান্তর। তাই হয়তো বা এলোমেলো কিছু বলে ফেলতেও পারি।

তবে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যে পরের কোন একটা কনফারেন্সে এই প্রজেক্টটাই সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল। সেই সময়ে আলোচনার প্রধান অংশ জুড়ে ছিল এই ধরনের প্রজেক্টের ফলাফল পারিপার্শ্বিক বিষয়ের ওপরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া আনতে পারে। তারমধ্যে পড়ে বয়েলিং ওয়াটার, আইরনাইজিং অফ এয়ার এবং ডিম্যাগনিজাইং অফ এটম। কারণ একস্‌পেরিমেণ্টের সময়ে এই মিডিয়ামগুলোর মধ্যে অস্থিরভাব দেখা দেবে। অবশ্য স্বীকার করা উচিত

যে এই সময়ে কেউ-ই ইন্টার ডায়মেনসেনাল এফেক্ট বা মাস্ ডিস্প্লেসমেন্টের কথা ভাবে নি। ব কারোর চিন্তাতেও আসে নি। ১৯৪০ সাল নাগাদ ব্যাপার দু'টো বৈজ্ঞানিকরা সাইন্স ফিক্সানের চোখেই দেখতো, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নয়। এই ব্যাপারেই আলব্রাখ্ট একদিন আমার ওপরে অত্যন্ত রেগে যায়, কেন তুমি যার এক্সপেরিমেন্টট করতে যাচ্ছ, তাদের ওপরেই সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে না? তাহলে ওরা ওদের প্রোজেক্ট নিয়ে যা পারতো, এগোতো। আমাদের সঙ্গে ওদের সেই রকমের কথাবার্তাই ছিল।

প্রোজেক্টটার একটা বড় সমস্যা হলো, এর শক্তিক্ষেত্র এতে নিবিড় আয়নিজেসান্ তৈরী করে যে তার ফলে আলোর রিফ্রাকসন অসমান হ'তে বাধ্য। কনফারেন্সের আগে আমাদের কাছে যেসব চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরা হয়েছিল তা'তে শংকিত হওয়ার কোন কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু আলব্রাখট, গ্রীসন এবং আমি অংক-টংক কষে দেখি ফলাফল কিন্তু তত পরিষ্কার নয়। প্রথমত মিরেজ এফেক্ট স্থির থাকবে না। বরং সামনে পেছনে দোদুল্যমান হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। কারণ হিসাবে বলা যায় এ সি শক্তিক্ষেত্রের চরিত্রই এই ধরনের। তা'তে সন্দেহজনক একটা অঞ্চলের সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। সম্পূর্ণরূপে বড় মুক্ত অঞ্চলের সৃষ্টি হবে কিনা তা' সঠিক-ভাবে কিছু বলা যায় না। 'সন্দেহজনক' কথাটা কিন্তু অনেক হালকা-ভাবে বলা। কিন্তু তখন এটাকেই সঠিক বলে মনে হয়েছিল। এই সন্দেহজনক এলাকার বাইরে শমাংক হ'তে বাধ্য, তারপরে ষ্ট্যাটিক ফিল্ড বা অনড় ক্ষেত্র। যাইহোক, আমাদের এন ডি আর সি'র কাছে মূল বক্তব্য ছিল এই ব্যাপারগুলোকে খতিয়ে দেখতে। এবং পুরো ব্যাপারটাকে নিয়েই অতি সতর্কতার সঙ্গে এগোতে। তবে আমাদের ধারণা ছিল যে সতর্কতার সাথে চললে কয়েকটা বিরূপ-প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। আর তার ফলে যে রিসোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যেতে পারে, তা দিয়ে ভিস্যুয়েল এপারেণ্ট ইন্টারনেল অসিলেসানকে আয়ত্তে রাখাটাও হয়তো বা

সম্ভব হবে, আর সেই ক্ষেত্রে শিমারিংটাও হবে অনেক ধীর গতিতে। তবে সত্যি বলতে কি আমার জানা নেই সমস্যাগুলোকে এড়াতে ওরা কি করে ছিল।

পরে অবশ্য কয়েকটি মিটিংয়ে এইসব সমস্যাগুলোর কথা উঠেছিল, আমার স্মৃতি সেইসব বিষয়েই তমধ্যে অনেক অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে এটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আলবার্ট টের অফিস মিটিংয়ের পরে প্রায়ই আমাদের কাছে একটা অনুরোধ আসতো, সেটা হলো দৃষ্টির মধ্যে রিসোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি অফ লাইটের বিষয়ে কয়েকটা টেবল বা তালিকা করে দেওয়ার জন্য। তাইতেই মনে হয় এই দুই ব্যাপারে কোথাও একটা যোগাযোগ ছিল।

বাইনহার্ট এই পর্যন্ত শেষ করে ঘরের চারদিকে এমন ভাবের দৃষ্টি নিয়ে তাকায় যে যতটুকু বলার তারচেয়ে বেশী যেন ও আমার কাছে বলে ফেলেছে পরমুহূর্তেই আবার আগের প্রসঙ্গ ফিরে আসে।

আমি অবশ্য তখন চিন্তা করতে সুরু করেছি সি এম অ্যালেন ঠিক এই মডেল নাটকের কোন অংশে নাটকে প্রবেশ করেছে। হ'তে পারে টাইলর মডেল বেসিনে যখন এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ সুবিধা ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। তবে কিছুটা অংশ যে অ্যানাকাষ্টিয়া থেকে চালানো হয়েছিল সেই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে রাডারের কার্যাবলী। এবার বাইন-হার্টের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখি,—আচ্ছা বলতে পারেন, এক্সপেরিমেন্টটা চালানোর জন্য ওরা জাহাজ জোগাড় করেছিল কিভাবে? এবং কোথা থেকে? কেউ নিশ্চয়ই এতে বড় দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল। সন্দেহ নেই প্রশ্নটা উত্তরের অপেক্ষা রাখে। আমি দু' দুবার ভেবেছি আপনার কাছে ক্যাপ্টেন পারসনসের নাম-ই উল্লেখ করবো। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, ক্যাপ্টেন পার-সনসের পুরো নাম হলো উইলিয়াম এস পারসনস্। ১৯৪৫ সালে হিরোসিমার ওপরে যে এটম বোমাটা ফেলা হয়, এই ক্যাপ্টেন পারসনস্ই সেটা এনোলা গে' বিমানে করে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই জাহাজের এক্স-

পেরিমেণ্টে ব্যাপারেও ক্যাপ্টেন পারসনস্ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাতেই অভিনয় করেছে। ১৯৩৯ সালে অন্য আরেকটা প্রজেক্ট নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, সেই আলোচনায় আমার ওপর-ওয়ালারা সবাই একমত হয় যে, একটা জাহাজের ওপরে নতুন একটা যন্ত্রের পরীক্ষার জন্য জাহাজ জোগাড় করা একমাত্র পার-সনসের পক্ষেই সম্ভব। এই সময় ক্যাপ্টেন পারসনস্ ছিল কমাণ্ডার পারসনস্। নেভেল আকাদমীর নামকরা গ্র্যাজেুয়েট এবং স্বনামধন্য গবেষক বিজ্ঞানী। কনফারেন্সে আসার সময় ক্যাপ্টেন পারসনসের সঙ্গে দু' তিন জন করে লেফ্টেনান্ট সঙ্গে আসতো। অবশ্য তাদের কথা বা চেহারা আমার আবছা আবছা মনে পড়ে।

মার্চেণ্ট শিপ্টাই এই ক্ষেত্রে অবজারভার শিপ্ হিসেবে কাজ করেছিল। হয়তো বা ইউ এস মারটাইম কমিশনের প্রধান এড-মিরাল জেরী ল্যাণ্ডের এই বিষয়ে হাত ছিল। লোকটা এক কথায় শক্ত ধাতের মানুষ। তবে সাহায্যের হাত সবসময়েই বাড়িয়ে থাকতো ; বিশেষ করে নেভী যেখানে এগোত না। অনেকবার নেভীর থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এর সাহায্যেই মার্চেণ্ট শিপের ওপর অনেক যন্ত্রপাতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা চালিয়েছি। এই প্রজেক্টের জন্যও আমি নিঃসন্দেহ যে এডমিরাল ল্যাণ্ডের কাছেই একটা জাহাজ সারেং সমেত চাওয়া হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর মতে সর্বদা নজর ছিল এডমিরাল ল্যাণ্ড যাতে নেভীর কাছে অপদস্থ না হয়। এবং সেই-জন্য যেসব সারেঙ একস্পেরিমেণ্টের জাহাজে ছিল, তারা নিখুঁত হাতে বাছা এবং সাহসী।

মোটামুটি ভাবে ডক্টর রাইনহার্টের চাঞ্চল্যকর কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। এর প্রায় মাস পাঁচেক পরে ডক্টর রাইনহার্ট হঠাৎ মারা যায়। এই পাঁচ মাস মুরের সঙ্গে রাইনহার্টের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এবং তখন মাঝে মাঝে যে টুকরো টুকরো সংবাদ প্রজেক্টের বিষয়ে মুর রাইনহার্টের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে, পরের অধ্যায়-গুলোয় তা' ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একটা ঘটনা বলা এখানে হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হিটলার ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে অনেক জার্মান বিজ্ঞানী জার্মানী ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় বসবাস করতে আসে। বলাবাহুল্য হিটলারের ভয়ে একটা কনফারেন্সে এমন একজন জার্মান বিজ্ঞানীকে আমেরিকান নেভী থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে জার্মান বিজ্ঞানীরাও কি এই ধরনের কোন প্রজেক্টের ওপর কাজ করেছে ?

ডক্টর রাইনহার্ট বলে,—কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সেই জার্মান বিজ্ঞানী উত্তর দেয়,— জার্মানরা আক্রমণ করতেই ভালোবাসে। প্রতিহত করার ব্যাপারটা ওদের কাছে খুব পছন্দের নয়। আর মিত্রপক্ষকে তো শত্রু হিসেবে অনেক নীচুস্তরের বলেই ভাবে জার্মানরা।

ডক্টর রাইনহার্টের কথাবার্তায় এলেণ্ডেকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও সন্দেহ নেই যে ডক্টর রাইনহার্ট এই এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণেই অংশ নিয়েছিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে আর একটা রহস্যের সূত্র পেছনে পড়ে থাকে। এলেণ্ডে কি ডক্টর রাইনহার্টকে চিনতো ?

## ॥ দশ ॥

শক্তি আর শক্তিক্ষেত্রই কি তাহলে ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের সময়ে অদৃশ্যতার সৃষ্টি করেছিল ? ডক্টর মরিস জেসাপের ধারণাই কি তাহলে সত্য, যে এই শক্তিই উফোকে পরিচালনা করেছে ? আমরা যদি আমেরিকার উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারক টমাস টাউনসেণ্ড ব্রাউনের জীবন নিয়ে আলোচনা করি, তবে হয়তো বা এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর পেলেও পেতে পারি। ডক্টর রাইনহার্টের মতোই ব্রাউনও ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টে যে অংশ নিয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই

জানেসভিলে, ওহিওর এক নামকরা পরিবারে টাউনসেণ্ড ব্রাউন ১৯০৫ সালে জন্মগ্রহণ করে। খুব ছোটবেলা থেকেই মহাশূন্যে বিচরণ সম্পর্কে টাউনসেণ্ডের অদম্য ঔৎসুক্য ছিল। বিশেষ করে

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের মহাকাশে ওড়ার সাফল্যের পরেই অনেকের চিন্তা-ভাবনা এদিকে ঘোরাফেরা করতে সুরু করে। টাউনসেণ্ডের ইলেক্ট্রনিক সম্পর্কেও কৌতূহল কম ছিল না। রেডিও ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম নিয়ে অনেক সময়ই কাটাতো। পরবর্তী জীবনে ছোটবেলার এই ভালোবাসা অনেক কাজেই এসেছিল এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় ব্রাউনের কোলিজ্ একস্‌-রে টিউব হাতে আসে এটাই ওকে ভবিষ্যতে বিরাট এক আবিষ্কারের সহায়তা করেছিল।

তখনো পর্যন্ত একস্‌-রে বা রনজেণ্ট রে কে অজানা এক শক্তি বলে সবাই ধরে নিতো। আমেরিকান পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ উইলিয়াম ডি কোলিজ্ টিউব আবিষ্কার করেছে মাত্র ১৯১৩ সালে। বিজ্ঞানের তখনো অনেক কিছু জানার বাকী ব্রাউনের কিন্তু একস্‌-রে সম্পর্কে তেমন কোন কৌতূহল ছিল না। তবে ওর ধারণায় মহাকাশ চারণের চাবিকাঠি হয়তো বা এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তাই ব্রাউন কোলিজ্ টিউব থেকে নির্গত রশ্মির মধ্যে প্রাণপ্রাণ এই রকমের কোন শক্তিকে খুঁজে বেড়ায়।

এবারে ব্রাউন একটা কাজ করে বসে, যা ওর সমকালীন কোন বিজ্ঞানী চিন্তাও করেনি কোলিজ্ টিউব নিয়ে অতি সূক্ষ্ম এক দাঁড়িপাল্লায় মাপতে সুরু করে। যদি কোন শক্তি তা'তে ধরা পড়ে; কিন্তু না। তবে হঠাৎ একটা ব্যাপার ওর নজরে আসে। টিউবটায় অদ্ভুত একটা রহস্য রয়েছে। একটা শক্তি কাজ করছে, যা, নাকি থ্রাস্টের সাহায্যে টিউবটাকে ঘোরাতে চেষ্টা করছে। অনেকদিনের পরিশ্রমের পর ব্রাউন বোঝে এর সঙ্গে একস্‌-রে'র কোন সম্পর্ক নেই। ভোলটেজ্ বিদ্যুৎ যা নাকি রশ্মি সৃষ্টি করেছে, সেটাই এই থ্রাস্টের পেছনে রয়েছে।

এই নতুন শক্তিকে আবিষ্কারের জন্য ব্রাউন পর পর কিছু একসপেরিমেণ্ট করে। এবং শেষপর্যন্ত এই একসপেরিমেণ্টের জন্য একটা যন্ত্রও তৈরী করে। নাম দেয় "গ্রাভিটর"। সাদামাটা যন্ত্রটা ব্যাকালাইটের একটা বারো ইঞ্চি লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া স্কোয়ার

বাক্স। স্কেলে ফেলে সেই বাক্সের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। তাতে দেখা যায় বাক্সটা এক শতাংশ ওজন হয় হারাচ্ছে, না হয় লাভ করছে।

ব্রাউন তখন স্থির নিশ্চিত যে নতুন ধরনের কোন বৈদ্যুৎ তত্ত্ব ও আবিষ্কার করে ফেলেছে; কিন্তু ব্রাউন তখনো জানে না ব্যাপারটা কি এবং এটাকে নিয়ে ও কী করবে। যদিও কয়েকটা সংবাদপত্রে খবরটা প্রকাশিত হয়, তবু বিজ্ঞানীমহল ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেয় না। টাউনসেন্ড ব্রাউনের বয়সও তখন খুব অল্প; হাইস্কুলের থেকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পথে।

১৯২২ সালে ব্রাউন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা সংক্ষেপে ক্যালটেকে ভর্তি হয়। প্রথম বছরে প্রফেসারদের যথেষ্ট স্নেহ যে ব্রাউন পেয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পরলোকগত পদার্থবিদ এবং নোবেল লরিয়েট ডক্টর রবার্ট এ মিলিক্যান যথেষ্ট ভালবাসতো ওকে। তবে ওর ইলেকট্রোগ্রাভিটির চর্চা থেকে ওকে ল্যাবরেটরিতে সবাই বেশী পাত্তা দিত না। ওর শিক্ষকেরা তখন উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারগুলো নিয়েই মাতোয়ারা। নতুন কোন চিন্তাধারা নিয়ে মাথা ঘামাতেই রাজী নয়।

বেপরোয়া ব্রাউনকে কেনন কলেজ, গ্যাম্বিয়ার ওহিওতে বদলী করা হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছর সেখানে পড়ার পর আবার বদলী হয় ডেনিসন ইউনিভার্সিটি, গ্র্যানভিলে, ওহিওতে। সেখানে প্রফেসার ডক্টর পাউল আলফ্রেড বেফেলডের অধীনে ব্রাউন ইলেকট্রোনিকস্ নিয়ে পড়াশোনা করে। পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ ডক্টর বেফেলড্ সুইজারল্যাণ্ডে আইনষ্টাইনের সহপাঠী ছিল। আইনস্টাইনের সহপাঠীর সংখ্যা ছিল আট; সেই আটজনের একজনই হলো ডক্টর বেফেলড্।

ক্যালটেকের ডক্টর মিলিক্যানের মতো না হয়ে ডক্টর বেফেলড্ ব্রাউনের আবিষ্কারে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে ছাত্র-শিক্ষক একসঙ্গে আরো গভীর গবেষণায় ডুবে যায়। ফলশ্রুতি হয় 'বেফেলড-ব্রাউন এফেক্ট' আবিষ্কারে।

লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে টাউনসেণ্ড ব্রাউন ওহিওর সোয়াজে অবজারভেটারীর ষ্টাফ হিসেবে যোগদান করে। চার বছর ব্রাউন এই অবজারভেটারীতে কাজ করেছিল। তখনই বিয়ে করে। ১৯৩০ সালে ব্রাউন অবজারভেটারীর চাকরী ছেড়ে দিয়ে ওয়াশিংটন ডি, সি'র নেভেল রিসার্চ ল্যাবরোটারীতে চাকরী নেয়। রেডিয়েসোন, ফিল্ড ফিজিকস্ এবং স্পেকট্রোগ্রাফিতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

১৯৩২ সালে অর্থাৎ জীবনের এই সন্ধিক্ষণে ব্রাউন ইউ এস নেভী ডিপার্টমেণ্টের হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, যায়; ইনটার ন্যাশানাল গ্রাভিটি একস্পিডিসনে অংশ নিতে। তার পরের বছর পদার্থবিদ হিসেবে যায় জনসন—স্মিথসোনিয়ান ডিপ, সী একস্পিডিসনে। এর পরেই আসে, আমেরিকায় হতাশার বছরগুলো। নেভেল রিসার্চ ল্যাব, সংক্ষেপে এন আর এলে'র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে টাউনসেণ্ড ব্রাউনকে চাকরীর খোঁজে বেরতে হয়। ডক্টর জেস্নুপ এবং রাইনহার্টের মতোই অবস্থা তখন ব্রাউনের। নেভী রিজার্ভে যোগদান করে প্রথমে চাকরী পায় ফেডারেল ইমারজেন্সী রিলিফ এডমিষ্ট্রেসনে, সয়েল ইনজিনীয়ার হিসেবে। তারপরে এডমিনেষ্ট্রেটর নিযুক্ত হয় সিভিলিয়ান কনজারভেসন করপের ওহিওতে।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত দিনে পেশাগত ব্যাপারে খাটলেও রাত্রে ব্রাউন ফিজিক্স আর বেফেলড্-ব্রাউন থিয়োরী নিয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকতো। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোও বাদ পড়তো না। এই সময়েই অক্লান্ত পরিশ্রমে 'গ্রাভিটর' যন্ত্রটার প্রচুর উন্নতি করে ব্রাউন।

১৯৩৯ সালে ব্রাউন নেভী রিজার্ভের লেফ্‌টেনাণ্ট হয়ে মেরীল্যাণ্ডে আসে। গ্লিন এল মার্টিন কোম্পানী, বাল্টিমোরের মেটিরিয়াল ম্যানেজারের দায়িত্ব তুলে নিতে। মাত্র কয়েক মাস সেখানে কাজ করার পর নেভীর ব্যুরো অফ্ শিপস্ ওকে ম্যাগনেটিক এবং অ্যাকুউসৃষ্টিক রিসার্চের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের পদ নেওয়ার জন্য ডাকে। এই সময়েই ব্রাউন একটা প্রজেক্টের শৈশবস্থার সঙ্গে

জড়িয়ে পড়ে। সেই প্রজেক্টটাই সম্ভবত ফিলাডেলফিয় একস্পেরিমেন্ট। ডক্টর রাইনহার্টের ভাষায়ঃ

আমার বিশ্বাস ব্রাউনকে যখন মার্টিন কোম্পানী থেকে ব্যুরো অফ্ শিপস্ অ্যাকুউসষ্টিক এবং ম্যাগনেটিক মাইন সুইপিংয়ের অফিসার-ইন চার্জ করে আনা হয় তখন সমস্ত প্রজেক্টগুলোর ইনচার্জ ছিল রস গান। নেভেল রিসার্চ ল্যাবের কাছে যে সমস্ত প্রজেক্টগুলো জমা পড়ে রয়েছে, ব্রাউনের ভিত্তিভূমি পদার্থবিদ্যা হওয়াতে তাকে দেখানো হয় প্রজেক্টগুলো। সম্ভবতঃ তার মধ্যে ফিলাডেলফিয়া একস্পেরিমেন্ট প্রজেক্টটাও ছিল। নেভেল রিসার্চ ল্যাব এই কাজের জন্য অনেকদিন ধরেই নতুন লোকের সন্ধান করছিল। সম্ভবত ব্রাউন-ই হলো এই নতুন লোক। কারণ ওরা এই ধরনের লোক খুঁজছিল যে কাদায় পা ডুবিয়ে বসে থাকবে না। নিঃসন্দেহে ব্রাউনের মতো লোকের পক্ষে ক্যাপ্টেন গারসনসের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা সম্ভব।

যদিও ব্যক্তিগতভাবে কখনোই ব্রাউনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় নি, কারণ ব্রাউন কাজ করতো অন্য ডিপার্টমেন্টে, তবু কনফারেন্স চলাকালে ছুটছাট আলোচনা হয়েছে ব্রাউনের সঙ্গে আমার। কারণ বেশ কয়েকবার আমার টেবিলেই বসছিল। তবে ব্রাউন বরাবরই লাজুক এবং চুপচাপ ধরনের পুরুষ হওয়ায়, ওর চিন্তাধারা এবং গবেষণার কাজ নিয়ে ওর বন্ধুরাই যা সবার আলোচনা করতো। পারতপক্ষে নিজের ব্যাপারে ব্রাউন বড় একটা মুখ খুলতো না। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ব্রাউন কি কখনো ওতপ্রোতভাবে ফিলাডেলফিয় একস্পেরিমেন্ট প্রজেক্টটার সঙ্গে জড়িত ছিল? এই প্রশ্নের সদুত্তর বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে এই একস্পেরিমেন্টের বেশ কিছুটা অংশ ব্রাউনের অধীনেই করা হয়েছিল। বিশেষ করে হাই-ভ্যাকুয়েমের কাজগুলো।

ব্যুরো অফ্ শিপস্, যার কর্তৃত্বে ছিল ব্রাউন—এই গবেষণার ব্যাপারে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ান ডলার খরচা করেছে। এক ডজনের ওপর পি এইচ ডি এর অধীনে কাজ করেছে। অবশ্য জাপানীরা পার্ল

হারবার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছবিটা বদলে যায়। ব্রাউনকে লেফটেনাণ্ট কমাণ্ডার করে নরফোল্ক পাঠানো হয়, যাতে নেভীর আটলান্টিক ফ্লিট্ রাডার স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে ওর পক্ষে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

আবার আরেক সংবাদ সূত্র অনুসারে এই ব্রাউন আংশিক রাডারের চোখ থেকে অদৃশ্য করা যায় এমন ইলেকট্রো ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্‌ডকে ব্যবহার করে, সেই সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছিল। ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেণ্টে সেই তথ্যগুলোর ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কারণ ব্রাউন নিজের মতামত কখনই দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরতেন না যদি না বাকীরা দৃঢ়ভাবে ওকে সমর্থন জানাতো।

তারপরেও তু'বছর দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্রাউন। কিন্তু ১৯৪৩ সালে সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে ভেঙে পড়ে ব্রাউন। ব্রাউনকে কর্তৃপক্ষ বিশ্রামের জন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। এরপরেই একদল চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে চাকরী থেকে অবসর দিয়ে দেওয়া হয়। তবে কৌতূহলের ব্যাপার হলো, রেয়লি ক্র্যাস্‌ বলেছিল যে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিণ্টের জন্যই নাকি ব্রাউনের এই অবস্থা হয়েছিল। ডি ই ১৭৩ এর নাবিকদের অবস্থা দেখে যে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত ব্রাউন পেয়েছিল, তা' আর সামলে উঠতে পারে নি।

যাইহোক, এর ছ'মাস পরে, ১৯৪৪ সালের বসন্তকালের শেষা-শেষি ব্রাউন ক্যালিফোরনিয়ার লক্‌হেড ভেগা এয়ারক্র্যাফট করপো-রেসনে রাডার উপদেষ্টার চাকরী নেয়। ডক্টর রাইনহার্টের মতো এখানকার ওর সহকর্মীদের ধারণা, ব্রাউন চুপচাপ জড় কিন্তু ইন্‌জিনী য়ারিং সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত চমৎকার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; তখনো পর্যন্ত ব্রাউন কিন্তু গ্রাভিটর যন্ত্রটা নিয়ে কাজ করে চলেছে। শুধু যন্ত্রটার নাম বদলে রেখেছে ষ্ট্রেস ইন্ ডায়োলিক্‌টিস্।

লকহেডের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এরপর ব্রাউন যায় হাওয়াইতে; বসবাসের জন্য। আর ফাঁকে ফাঁকে নিজের গবেষণাটাও যাতে

চালিয়ে যেতে পারে। এখানেই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় পুরনো বন্ধু এ এস কিটসেনম্যানের সঙ্গে। পার্লহারবারে কিটসেনম্যান ক্যালকুলাস শেখাতো। দুই বন্ধুতে এবারে উঠে পড়ে লাগে গ্র্যাভিটর যন্ত্রটার উন্নতি সাধনে। ইউ এস প্যাসিফিক ফ্লিট কমাণ্ডার ইন চীফ এডমিরাল আর্থার ডবলু রাডফোর্ড এই বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়। এডমিরাল রাডফোর্ড পরে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের অধীনে ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছে। রাডফোর্ডের চেষ্টায় ব্রাউন সাময়িকভাবে পার্ল হারবার নেভী ইয়ার্ডের উপদেষ্টার কাজ পায়। তবে ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় ব্রাউনের আবিষ্কারকে ওরা কৌতূহলের চোখেই দেখেছে, মহাকাশ বা ইনটারডায়মেনসানাল ভ্রমণের উপযুক্ত আবিষ্কার বলে মনে করে নি। মূলত তার কারণ হিসেবে বলা যায় ব্রাউনের ভেতরে সেলসম্যানশিপ ছিল না।

ইতিমধ্যে উফো নিয়ে কম হৈ চৈ পড়ে নি। ব্রাউনেরও কৌতূহল এই বিষয়ে জেগে ওঠে। চল্লিশ দশকের শেষাদ্ধে এবং পঞ্চাশ দশকের সুরুতে সামরিক বিভাগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে উফো নিয়ে যথেষ্ট বাগ বিতণ্ডা সুরু হয়। উফোর সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল ওদের জ্বালানির উৎস সন্ধান। ব্রাউনের ধারণায় টাকা এবং লোকবল হলে উফোর জ্বালানির উৎস ওর পক্ষে খুঁজে বার করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ ওর ধারণায় এর পেছনে ইলেকট্রোগ্রাভিটিকস শক্তি কাজ করে চলেছে।

১৯৫২ সালে ক্লেভল্যাণ্ডে গিয়ে আরেকটা প্রজেক্টের চিন্তা ব্রাউনের মাথায় আসে। প্রজেক্টটার নাম দেয় উইন্টারহ্যভেন। ব্রাউন ভাবে যে প্রজেক্টটা ও সামরিক বিভাগে বিক্রী করে দিতে পারবে। ক্রমাগত ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা করে শেষপর্যন্ত ব্রাউন ওর গ্রাভিটর যন্ত্রের সাহায্যে এমন একটা ওজন তুলতে সমর্থ হয়, যেটা নাকি যন্ত্রের চেয়ে ভারী। ব্রাউন ওর গবেষণার এই ফলাফলকে ইউনিফাইড ফিল্ড ফিজিক্সের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়। এক কথায় বলতে গেলে, বলতে হয় বেফেলড-ব্রাউন এফেক্টকে

ব্রাউন মনে করতো ইলেক্ট্রিসিটি আর গ্রাভিটির মধ্যের বন্ধনসেতু। ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্টে ব্রাউনের এই ধ্যান ধারণা আর তত্ত্বেরও ব্যবহার করা হয়েছিল। এরপর ব্রাউন আমেরিকা ছেড়ে আসে ইউরোপে। যদি বা ভাগ্যের দেখা মেলে। কিন্তু হা হুতোস্মি।

ব্রাউন বছরখানেক ইউরোপে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে আবার ফিরে আসে আমেরিকায়। হোয়াইট হল র‍্যাণ্ড প্রজেক্টের চীফ রিসার্চ এবং ডেভেলপমেণ্ট কনসালটেণ্ট হিসেবে যোগ দেয়। অ্যাগ্‌নিউ বেনসেন, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার বেনসন কোম্পানি অফ উইনষ্টন—সালেম কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট ব্যক্তিগত ভাবে উফো সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে উৎসাহী ছিল। বেনসনের প্রবল ইচ্ছা ছিল চাঁদে প্রথম পদার্পণ করার। সেই উৎসাহে-ই গাঁটের কড়ি ঢেলেছিল এই প্রজেক্টে। তৈরী করেছিল আধুনিক সুসজ্জিত একটা ল্যাব। ব্রাউনও অনেক উৎসাহ নিয়েই এখানে যোগদান করেছিল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। মিস্টার বেনসন অভিজ্ঞ পাইলট হলেও হঠাৎ তার ব্যক্তিগত প্লেনটা হাই-টেনসান বিদ্যুতের তারের ধাক্কা খেলে বেনসনের মৃত্যু হয়। ওর উত্তরাধিকারীরা এই প্রজেক্টের ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী না থাকায় প্রজেক্টটা ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিকেয় ওঠে।

১৯৫০ সালে ব্রাউন নিজেই একটা কোম্পানি খোলে। নাম দেয় র‍্যাণ্ড ইন্‌টারন্যাশনাল লিমিটেড। ব্রাউন হয় এই কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট। প্রথমদিকে এই কোম্পানির বিভিন্ন কার্যকলাপে সামরিক ও বেসামরিক অনেক কোম্পানি উৎসাহ দেখালেও অচিরেই সেইসব নিভে যায়। কেউ যেন অলক্ষো ওর ভাগ্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত কাজ করে চলেছে। র‍্যাণ্ড ইনটারন্যাশানালের অস্তিত্ব আজও বজায় রয়েছে কিন্তু শুধু নামেই প্রতিষ্ঠানটার কাজকর্ম বলতে কিছু নেই।

ষাট দশকের প্রথম দিকে ব্রাউন অল্প কিছুদিনের জন্য পেনসিলভে-নিয়ার বালা সায়নডের ইলেক্‌ট্রোকাইনেটিস্‌ লিমিটেড কোম্পানিতে পদার্থবিদ হিসেবে চাকরী করার পর চাকরী যায়; তারপরেই ব্রাউন

লে আসে ক্যালিফোর্নিয়ায়। গবেষণা নিয়ে মেতে থাকে। আশা, ভাগ্য নিশ্চয়ই একদিন সদয় হবে। পৃথিবীর চোখ পড়বে ওর গবেষণার দিকে।

আমেস রিসার্চ সেন্টার অফ নাসার সঙ্গে যুক্ত হয় ব্রাউন। বিশেষ করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিক্ষেত্র এবং রক ইলেক্ট্রিসিটির মধ্যের সম্পর্কটা খুঁজে বার করতে। এক কথায় পেট্রো ইলেক্ট্রিসিটি। ইউনিফাইড ফিল্ড ধারণাকেই ভিত্তিভূমি করে।

যাইহোক, গত কয়েক বছরে বিজ্ঞান এতো উন্নতি করেছে যে স্পেস, ম্যাটার, এনার্জি এবং টাইম—প্রভৃতি বিষয়গুলোর ধ্যান ধারণাই বদলে গেছে। হলডনের মন্তব্যটা এইখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য: আমরা যে অপরূপ পৃথিবীর কল্পনা করি, সত্যিকারের পৃথিবী তারচেয়ে অনেক বেশী অপরূপা।

## ॥ এগারো ॥

মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনের দিন থেকেই পাখীকে উড়তে দেখে তার মনও ছুটে গেছে নীল আকাশে চাঁদের দেশে। তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার টেকনিক্যাল জ্ঞানও বেড়েছে। বেড়েছে অভিলিপ্সা। কালকের স্বপ্ন আজকে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে; কিন্তু স্বপ্নের শেষ কোথায়? পরমুহূর্তেই মনের কোণে এসে ভীড় জমিয়েছে আরো দশটা স্বপ্ন।

তবে বহু স্বপ্ন সফল হলেও অনেক দিনের একটা স্বপ্ন কিন্তু অপূর্ণই রয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে জীবনে অন্তত একবার কে না চায় অদৃশ্য হ'তে? আজকে বৈজ্ঞানিকদের কাছে মানুষের এই অতি প্রাচীন ইচ্ছেটাই কিন্তু বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষ করে এই অদৃশ্যতা যদি যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা যায়, তবে শত্রুপক্ষের হাত থেকে নিজেদের বাড়ী-ঘর, অস্ত্রশস্ত্রের কলকারখানা যেমন নিরাপদ, তেমনি শত্রুপক্ষকে আঘাত হানার সুযোগও কম নয়। অতর্কিতে ধরা যাবে তাদের

ইউ এস নেভী এবং যেসব তথ্য এতোক্ষণ ধরে পাওয়া গেছে, তার ওপর ভিত্তি করে কি বলা চলে ডিই ১৭৩-এর ওপরে সত্যই কি ইলেক্ট্রনিক একস্‌পেরিমেণ্টটা চালানো হয়েছিল? যার ফলাফল হয় ভয়াবহ।

সত্যি কথা বলতে কি, স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি এই বিষয়ে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না সরকারী ফাইলগুলো জনসাধারণের জন্য-খোলা হচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। নেভী এবং সরকারী তরফ থেকে এলেণ্ডে বা জেস্সুপের সমস্ত বক্তব্যকেই সোজাসুজি অস্বীকার করা হয়েছে। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকেই সায়েন্স ফিকসান বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। অন্য সরকারী সংস্থাগুলো তো এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে।

সরকারী তরফের নিশ্চ্পতা সত্ত্বেও খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ এবং ম্যাজিসিয়ান জোসেপ ডানইংগার সম্পর্কে একটা গল্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বরু থেকে সারা আমেরিকাতে বেশ চালু ছিল। আমেরিকা তখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি। জার্মানীতে প্রচলিত ছিল যে ব্রিটিশ প্লেন-গুলো এক বিশেষ ধরনের বার্ণিশ লাগিয়ে নিজেদের অদৃশ্য করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে রাত্তিরবেলা। এই অদৃশ্য অবস্থাতে এরা জার্মানীতে বোমা বর্ষণ করে যায়। ডানইংগার কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে এই বিষয় প্রচলিত গুজবটাকে নিজের পেশাগত কাজে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে। এর ফলে ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্টের দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্‌ের পাঁচ পাতায় নীচের সংবাদটা প্রকাশিত হয়:

জার্মানী থেকে খবর পাওয়া গেছে যে বৃটিশ গোপন এক বার্ণিশ প্লেনের গায়ে মাখিয়ে ওদের চেহারগুলোকে অদৃশ্য রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে রাতের বেলা। জোসেপ ডানইংগার, ম্যাজিসিয়ান এবং থট রিডার, বলে যে বিশেষ একটা যন্ত্রের সাহায্যই প্লেনগুলোকে অদৃশ্য করা হয়ে থাকে। আর এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছিল ইংল্যাণ্ডের জগৎ বিখ্যাত ম্যাজেসিয়ান হোরেস গোল্ডইন। যে বছর-খানেক আগে মারা গেছে।

যে যন্ত্রটার সাহায্যে দিনে অথবা রাত্রে প্লেনটাকে অদৃশ্য করা সম্ভব হয়, সেই যন্ত্রটা সম্পর্কে বিশদ্‌ভাবে ডানইংগার কিছু বলে নি। কিন্তু ডানইংগার দাবী করে একই ধরনের যন্ত্র আমেরিকাতে বসে সেও আবিষ্কার করেছে। যার সাহায্যে ডানইংগার ইতিমধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা মডেল ব্যাটেলশিপ্‌ অদৃশ্য করেছে ওয়াশিংটন. ডি সি'তে। তবে যে তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে যন্ত্রটা তৈরী করা হয়েছে, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে ডানইংগার নারাজ। এই যন্ত্রের সাহায্যে ডানইংগার নাকি সম্পূর্ণ একটা ব্যাটেলশিপ কে অদৃশ্য করে দিতে সক্ষম। যন্ত্রটির ওজন প্রায় ব্যাটেলশিপের এক দশমাংস। ডানইংগারের মতে সেই যন্ত্রটাকেই প্লেনে ব্যবহারের কোন অসুবিধে থাকার কথা নয়।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে এই খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পরেই সাংবাদিকরা ডানইংগারকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। নাচার ডানইংগার রাকস্‌টন হোটেল, ওয়াশিংটন ডি সি'তে ওদের একস্‌পেরিমেণ্টটা দেখাবে বলে একরকম বাধ্য হয়েই প্রতিশ্রুতি দেয়। হোটেলের ঘরের ভেতরে তো কোন ব্যাটেলশিপ্‌ আনা সম্ভব নয়, তাই জাহাজের একটা ছবিকেই ঘরভর্তি সাংবাদিকদের সামনে অদৃশ্য করে ডানইংগার। মিসেস ক্রিষ্টাল ডানইংগারের ঘটনা স্মরণে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈই কম হয় নি।

পরের দিনই নেভী ডিপার্টমেণ্ট থেকে চিঠি আসে। নেভী ডানইংগারের এই আবিষ্কার সম্পর্কে নাকি কৌতূহলী। সেই চিঠিতে ব্যাপারটার বিস্তারিত এবং এই বিষয়ে কোন রকম প্রদর্শন করা সম্ভব নাকি ডানইংগারের কাছে জানতে চেয়েছিল নেভী। তবে মিসেস ডানইংগারের মতে পুরো ব্যাপারটাই হাত সাফাই। সত্যিকারের এই ধরনের কোন যন্ত্রই ছিল না। সুতরাং ব্যাপারটার সমাপ্তি এখানেই হওয়া উচিত।

নেভীর চিঠির উত্তর না দেওয়াতে নেভী কর্তৃপক্ষ দু'জন অফিসারকে পাঠিয়ে দেয় ডানইংগারের কাছে ব্যাপারটা সাক্ষাতে

বিস্তারিত আলোচনা করতে। ডানইংগার নেভীর কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে পুরো ব্যাপারটাই নিছক তামাসা। এই প্রসঙ্গে ডানইংগার নেভীকে বলে যে কিভাবে সূর্যরশ্মির সাহায্যে নকল মরীচিকা সৃষ্টি করে ব্যাটেলশিপকে চোখের আড়াল করতে হয়, সে সম্পর্কে ওর নিজের একটা তত্ত্ব আছে। নেভী ওকে লিখিতভাবে পরিকল্পনাটা ওদের দিতে বলে। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করার পর ডানইংগার লিখিতভাবে ওর পরিকল্পনাটা নেভীকে জানায়। নেভী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দলিলে ওকে স্বাক্ষর করিয়ে নেয় যে এই ব্যাপারে কারো কাছে ও আর মুখ খুলবে না। ডানইংগার নেভীর কাছে ঠিক কি পরিকল্পনা দিয়েছিল এবং সেটা নেভীর কি কাজেই বা এসেছিল—এই ব্যাপারে দু'জনেই মুখ বন্ধ করে থাকায় জানার আর উপায় নেই।

ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেন্টের আগে এগুলোকে প্রস্তুতি বলা চলে। আরেক জন বিজ্ঞানী যে নাকি নেভীর তরফ থেকে এই ধরনের একস্‌পেরিমেন্টগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল, তার ভাষায়:

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পদার্থবিদরাও জড়িয়ে পড়ে; বিশেষ করে দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটির তরফে। এর পরের ধাপেই একটা ইউ এস নেভী শিপের ওপরে নিবিড় ইলেকক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। এই ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছিল ডিগাউসিং ইকুাপমেণ্ট ব্যবহার করে। রিসোনেন্‌স তত্ত্বের প্রয়োগে চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। সারেঙদের ওপরে চূড়ান্ত দৈহিক প্রতিক্রিয়া হয় এই একস্‌পেরিমেণ্টের ফলে। ফলাফল যাই হোক না কেন, ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে প্রজেক্টটাকে পরিত্যক্ত করা হয়।

তবে ফিলাডেলফিয়া একস্‌পেরিমেণ্ট যে সত্যই সংঘটিত হয়েছিল, সেই বিষয়ে আরো দু'জনের স্বীকৃতি চিঠির আকারে পাওয়া যায়। তারা চিঠি দু'টো লিখেছিল বি এস আর এফে'র ডক্টর রিয়েলি এইচ ক্র্যাব্‌কে।

গ্রীফিন ছিল নেভীর ষ্টাফ। গ্রীফিন ক্র্যাবের কাছে চিঠিতে জানায় যে ক্র্যাবের জেস্থপ এলেণ্ডের অদৃশ্য জাহাজের ওপর

একসপেরিমেন্টের ব্যাপারে উৎসাহের খবর ওর জানা। হয়তো বা চিঠিতে দেওয়া খবরটা ক্র্যাবের কাছে সামান্য হলেও উপকারে আসতে পারে ভেবেই দেওয়া।

কয়েক বছর আগে গ্রীফিন মেডিটেরিয়ানের সাইপ্রাস দ্বীপে কার্যরত থাকাকালে পুরনো ডি ই ১৭৩ জাহাজটার হঠাৎ দেখা পায়। তখন জাহাজটা অবশ্য গ্রীক্ নাম রয়েছে—লিঁয়। বন্দরে জাহাজটা থাকাকালীন একজন নাকি গ্রীফিনকে বলে যে এই জাহাজটার ওপরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকা অদৃশ্য হওয়ার একস্-পেরিমেন্টটা চালিয়েছিল ক্র্যাব বিশেষ করে চিঠিটার গুরুত্ব দিয়েছিল কারণ এলেণ্ডে পর্যন্ত জাহাজটার সঠিক নাম জানতো না। এলেণ্ডের ধারণায় এস এস ফুরুসেথের ওপরেই একসপেরিমেণ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু বহু বছর পরে প্রকাশ পায় যে ডি ই ১৭৩ ডেসট্রয়ারটার ওপরেই একসপেরিমেণ্ট করা হয়। ফুরুসেথ ছিল অবজারভার। গ্রীফিনকে তা'হলে এই সংবাদটা কে দিলো ?

দ্বিতীয় চিঠিটা আরো কৌতূহলোদ্দীপক। মিষ্টার শামেকের কাছ থেকে ক্র্যাব যে চিঠিটা পায় তার শেষের অংশটা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর : বি এস আর এফে'র পাবলিকেশন প্রসঙ্গে জানাই যে আমার কাকা, অবসরপ্রাপ্ত নেভীর ওয়ারেণ্ট অফিসার। ফিলাডেল-ফিয়া নেভী ইয়ার্ডের একটা গোপন একসপেরিমেণ্ট সম্পর্কে ১৯৫০ সালের শেষের দিকে আমাকে বলেছিল যে ঘটনার কথা এম কে জেসুপ-এর চিঠিতে চিহ্নিত।

১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে ইলেকট্রনিক কনট্রাকটার প্যাট্রিক ম্যাকে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলেছিল। তার নাম জিম। কথা-প্রসঙ্গে জিমকে প্যাট্রিক বলে,—জানো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি যখন নেভীতে ছিলাম, তখন রহস্যজনক একটা ঘটনা ঘটেছিল। না, উফোকে নিয়ে নয়। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে একটা অডিও ভিস্যুয়াসের প্রদর্শনীতে আমি প্রহরী ছিলাম। সেইখানে নেভী

যেসব একসপেরিমেণ্ট করছে, তার সব ছবি দেখানো হচ্ছিলো। একটা ছবির অংশ বিশেষ আমার এখনো মনে আছে। বসে দেখার সুযোগ না থাকায় পুরোটা অবশ্য আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। তবে ছবিটাতে ভাষা ছিল না। তিনটে জাহাজ এক সারিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় জাহাজ থেকে একটা শক্তি যেন বিচ্ছুরিত হয়ে দ্বিতীয় জাহাজটার ওপরে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় জাহাজ, যেটা একটা ডেসট্রয়ার, ধীরে ধীরে ঘন কুয়াসার মধ্যে মিলিয়ে যায়। জলের ওপর শুধু জাহাজটার ছাপ আঁকা থাকে। সেই শক্তি-ক্ষেত্র যখন সরে যায় মনে হয় জাহাজটা পাতলা একটা কুয়াশার স্তরের থেকে যেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। সেই ঘরের মধ্যে কয়েকজন কিন্তু ব্যাপারটাকে নিয়ে আলোচনা করছিল। কারোর মতে শক্তিক্ষেত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলেই সারেঙদের ওপরে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া পড়ে। সেই আলোচনার সময়ে কয়েকজন এমন কথাও বলে যে কয়েকজন সারেঙ বারে বসে মদ খেতে যেতেই অদৃশ্য হয়, ক'জন আবার সারাটা জীবনের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হয়। বাকীরা প্রায় সবাই নিখোঁজ।

রহস্যের গভীরে আরো রহস্য এই যে, যারাই ব্যাপারটার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, বা অতর্কিতে গিয়ে পড়েছে, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে বা আত্মহত্যা করেছে রহস্যময় ভাবে।

এক মহিলা প্রেমে পড়েছিল এমন এক সারেঙের সঙ্গে, যে নাকি একসপেরিমেণ্ট চলাকালীন ডি ই ১৭৩ ডেসট্রয়ারটায় ছিল। একস-পেরিমেণ্টের পরেই সারেঙটা অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে নেভী তাকে বেলেদা হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। মহিলা হয়তো বা তার সেই প্রেমিক সারেঙের থেকে একসপেরিমেণ্টটার বিষয়ে অনেক কিছু জেনে থাকবে। অল্প কিছুদিন পরেই অদ্ভুত এক দুর্ঘটনায় ভদ্রমহিলা মারা যায়।

জেমস আর ডলফ ছিল মুক্ত লেখক এবং রকমারী বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুপ্রবণ। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে এই বিষয়ে একটা

বইও লিখতে সুরু করে। হঠাৎ একাদন ডলফ উধাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তাকে আর হদিশ করা যায় নি। আর ডক্টর জেসুপের মৃত্যুটাও তো এক কুয়াশার পর্দায় ঢাকা।

তাহলে সত্যিই কি ফিলাডেলফিয়া একসপেরিমেন্ট সংঘটিত হয়েছিল? এখনোও কি লোকচক্ষুর অন্তরালে আমেরিকান নেভী সেই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে? দু'টো প্রশ্নেরই উত্তর রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। সত্যের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া, হয় ফিলাডেলফিয়া একস্পেরিমেন্ট কোনদিনই হয় নি, তবে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে ফিলাডেলফিয়া নেভী ইয়ার্ডে-ই বা কি একসপেরিমেন্ট করা হয়েছিল?

—ঃ শেষ ঃ—

# চিরঞ্জীব সেনের

## ইউফো মিস্টি

অ্যামেরিকার নিউ মেকসিকো অঞ্চলে একাধিক ফ্লাইং-সস
ইউফো ভেঙে পড়েছে সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে প্রায় তিরিশটি খর্ব
মনুষ্যাকৃতি জীব। কিন্তু অ্যামেরিকা ঘটনাগুলি চাপা দেবার আপ্র
চেষ্টা করেও পারছে না। কিছু কিছু ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ঘটনা চা
দেবার কারণ কি? তবে কি সভ্যতা আছে অথচ মার্কিন রবে
পাল্লায় পড়ে এমন কোনো গ্রহের সঙ্গে অ্যামেরিকা যোগাযে
স্থাপন করেছে? সন্দেহের কারণ আছে। কারণ অ্যামেরিক
পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে দক্ষ ও কুশলী বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে
কয়েকটি অতি আধুনিক কমপিউটর সেণ্টার বসিয়েছে, উদ্দেশ্য ইউফো
এর প্রতি নজর রাখা এবং তাদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করা। ভারত
মহাসাগরে ডিয়েগো গারসিয়া নির্জন দ্বীপে কি এমন একটি কেন্দ্র
আছে? কে জি বি কি বলে?

অ্যামেরিকা কি ভিন্ন গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে?
অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে কিন্তু অ্যামেরিকা স্বীকার করতে চাইছে
না। কারণ কি? বারমুডা ট্র্যাঙ্গল অপেক্ষা চাঞ্চল্যকর। রহস্য
গভীরে।